বৌদ্ধ-ভারত

শ্রীশরৎকুমার রায়
বিদ্যারত্ন, সাহিত্যভূষণ-প্রণীত

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশঃ আষাঢ়, ১৩৩৮

প্রকাশক ঃ

করুণা প্রকাশনী

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

১৮এ টেমার লেন,

কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ

গৌরী প্রিণ্টার্স

বিভাস রায়

৬৫ বিধান সরণী,

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ ঃ

কমল আইচ

উৎসর্গ

যিনি ভক্ত যিনি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া ইহকাল ও পরকালের আনন্দলীলা প্রত্যক্ষ করিতেছেন মহাসাধকের সাধনারস-নিঃসৃত প্রাচীন ভারতের এই গৌরবময় ইতিবৃত্ত আমার সেই পূজনীয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের চরণকমলে উৎসর্গ করিলাম।

কেশবনিকেতন, কলিকাতা

ভক্তি-প্রণত
শ্রীশরৎকুমার রায়

নিবেদন

বৌদ্ধ-ভারত গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ নহে। দেশের ও বিদেশের বৌদ্ধশাস্ত্রানুরাগী সুধীগণের গ্রন্থাবলী ও রচনা অবলম্বনে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল। সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থের সহিত এক স্থলে এই গ্রন্থের পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। এই গ্রন্থখানি রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে। মহাপুরুষ বুদ্ধের সাধনা এই দেশে কি প্রকারে এক বিরাট সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল এই গ্রন্থে তাহাই প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যে সাধনার মূলে সত্যরত্ন নিহিত থাকে সেই সাধনা কিছু-না-কিছুর সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই ইহা জ্ঞাত আছেন, মোহম্মদ, নানক, কবীর, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের সাধনা ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাষ্ট্র কিংবা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে।

ইয়ুরোপের রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্তের আলোকে যাহারা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আলোচনা করেন তাহারা ঐ যুগের বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে কোনো ঐক্যসূত্র খুঁজিয়া পান না। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত যে অস্পষ্টতার কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ঐ যুগের বিচ্ছিন্ন ঘটনারাজির অভ্যন্তরে ঐক্যের একটি চিরন্তন ধারা ফল্গুর অন্তঃসলিলা ধারার মত নিঃসন্দেহে প্রবাহিত হইতেছে। ভারত-ইতিহাসের এই ঐক্যধারা সম্ভবতঃ যুগ-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষদের সাধনার অমৃতধারা। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র, ব্যাস-বাল্মীকি, বুদ্ধ-শঙ্কর প্রভৃতি মহাজনদের সাধনার মধ্যে ভারত-ইতিহাসের ঐক্যসূত্রের সন্ধান করিতে হইবে।

ছয় বৎসর কঠোর সাধনার ফলে মহাপুরুষ বুদ্ধ যে সত্য লাভ করেন উহার আকর্ষণে যাঁহারা তাঁহার চারিদিকে দলবদ্ধ হইলেন তাঁহাদিগকে লইয়া সঙ্ঘের সৃষ্টি হইল। এই সঙ্ঘের সাধুরাই মহাপুরুষের বাণী প্রচার করিতেন। সঙ্ঘের প্রভাব সমস্ত দেশের

উপর পতিত হইয়াছিল। সঙ্ঘ যখন বৃহৎ হইয়া দেশবাসীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিল তখন হইতে সঙ্ঘের সাধুদের আচার-ব্যবহার, ক্রিয়া-কর্ম্ম দেশবাসীর সমালোচনার বিষয় হইল। দেশ-বাসীদের অভিপ্রায় সঙ্ঘবাসীদের আচার-ব্যবহার নিয়মিত করিতে-ছিল। এইরূপে বৌদ্ধসঙ্ঘ এক বিরাট জনসঙ্ঘে পরিণত হইল।

বৌদ্ধভিক্ষুগণ নগরের বাহিরে প্রকৃতির সুরম্য নিকেতনে নিভৃতে বিহারে বাস করিতেন। বৌদ্ধভিক্ষুদের এই বিহারগুলিই সেকালে ধর্ম্ম ও শাস্ত্রালোচনার কেন্দ্র ছিল। সাধুরা শিষ্যদিগকে কেবল ধর্ম্ম নহে, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পরা ও অপরা বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করিতেন। এইরূপে ভগবান্ বুদ্ধের সাধনা হইতে প্রাচীন ভারতে যে আশ্চর্য্য সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল এই পুস্তকে তাহাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। যখন নদীতে বান আসে তখন খাল, বিল, নালা সমস্তই জলে পূর্ণ হইয়া যায়; বৌদ্ধধর্ম্মের অমৃতরসও সেইরূপ বানের মত ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়াছিল। সেই প্লাবণ ভারতবর্ষ ছাপাইয়া দেশান্তরেও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এমনই এক অভাবনীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার এই ভারতবর্ষে ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসাদে এই দেশে আমরা এমন এক ভূপতি দেখিলাম যাঁহার তুলনা পৃথিবীর আর কোন দেশে পাওয়া যাইবে না। ধর্ম্মবলে তিনি এমন সংস্কারশূন্য হইয়াছিলেন যে, স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মী সকলকে তিনি তুল্যরূপে ভালবাসিতেন। প্রজাদিগকে তিনি পুত্রবৎ পালন করিতেন। সাধারণ রাজার মত তিনি রাজস্ব আদায় এবং রাজ্যশাসন করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। রাজ্যের সর্ব্বত্র যাহাতে ধর্ম্ম ও সুনীতি প্রতিপালিত হয় তজ্জন্য বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত এবং বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিকগণ যে যুগটিকে বৌদ্ধযুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এই গ্রন্থে সেই যুগের বহু পূর্ব্বের এবং পরবর্ত্তীকালের কোনো কোনো কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উহার কারণ পাঠকগণ অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বৌদ্ধ-ভারত বৌদ্ধযুগের নহে, বৌদ্ধ-

সভ্যতার ইতিহাস। নানা দিক হইতে এই ইতিহাস বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইতে পারে। সেইরূপ আলোচনার অধিকার বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদেরই আছে। আলোচ্য গ্রন্থে সমস্ত বিষয়ই যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। আলোচনার জটিলতা পরিহার করিয়া পুস্তকখানি সকল শ্রেণীর পাঠকের উপযোগী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থ সঙ্কলনে আমি যেসকল গ্রন্থকার ও প্রবন্ধলেখকের রচনা হইতে আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাদিগকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে তাঁহার লিখিত 'তক্ষশিলা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের হস্তলিপি পাঠাইয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধ হইতে আমি কয়েকটি তথ্য সঙ্কলন করিয়াছি। প্রবন্ধলেখককে আমি এই জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। মদীয় শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ্ শ্রমণ শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ স্বামী মহোদয় আমার গ্রন্থের অধিকাংশ শ্রবণ করিয়া আমাকে কোনো কোন স্থান সংশোধনের সদুপদেশ প্রদান করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

কেশবনিকেতন, কলিকাতা
আষাঢ়, ১৩৩০

বিনীত
গ্রন্থকার

প্রথম অধ্যায়

বুদ্ধ ও বৌদ্ধশাস্ত্র

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের চিন্তারাজ্যে এক তুমুল বিপ্লব ঘটিয়াছিল। বহু শতাব্দী ধরিয়া এদেশের হিন্দু আর্য্যগণ যে ক্রিয়াকর্ম্ম, আচারঅনুষ্ঠান নির্ব্বিচারে মানিয়া আসিতেছিলেন, কালক্রমে সেই সকল অনুষ্ঠান এমন প্রাণহীন ও নীরস হইয়া পড়িয়াছিল যে, সেগুলি আর কাহারও চিত্তে ধর্ম্মবোধের সঞ্চার করিত না। অত্যাশ্চর্য্য নৈসর্গিক শোভায় বিহ্বল হইয়া ঋগ্বেদের ঋষিগণ স্বাভাবিক ভক্তির উচ্ছ্বাসে সরল বন্দনামন্ত্রে ইন্দ্র, বরুণ, ঊষা প্রভৃতি যে দেবতাগণের আরাধনা করিয়াছেন, তখনও সেই দেবতাগণের নাম উচ্চারিত হইত বটে, কিন্তু সেই নাম তখন কাহারও হৃদয়যন্ত্রে ভক্তিতারে ঝঙ্কার দিত না। এই সকল ঋষির বংশধরগণই বাহির হইতে চাপ পাইয়া নানা প্রয়োজনের তাগিদে আপনাদের কর্ম্ম বিভাগ করিয়া নানা বর্ণের সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন। কালে কালে সেই ভাগবিভাগ জাতিভেদের সৃষ্টি করিল। ঋষিদের বংশধরগণের এক দল হইলেন ব্রাহ্মণ; ক্রিয়াকর্ম্ম যাগযজ্ঞ ধ্যানধারণাই তাঁহাদের ব্যবসায় হইল। ইহাতে কোনও সুফল ফলে নাই এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু কালক্রমে এই প্রথায় লোকের মনে এই বোধ জন্মিল যে, যাজক পুরোহিতই তাহাদের প্রতিনিধি হইয়া ভগবানকে ডাকিবেন, ব্যক্তিগত ক্লেশ স্বীকার করিয়া

তাহাদের ধ্যানধারণার কোনও প্রয়োজন নাই। বেদের ঋষি যে ভাবের প্রেরণায় মন্ত্রার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া ভগবানের বন্দনা গান গাহিয়াছেন, সে ভাব সর্ব্বতোভাবে অন্তর্হিত হইল। মন্ত্রের আবৃত্তি, আয়োজনের অনাবশ্যক আড়ম্বর, ক্রিয়ার বাহুল্য এবং অনুষ্ঠানের প্রকরণ ভাবের অভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। ভাবের বিলোপের অনুপাতে কর্ম্মকাণ্ড বাড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু মানুষের হৃদয় তাহা মানিতে চাহিবে কেন? মানুষের চিত্ত আপনাআপনি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; প্রতিক্রিয়া সুরু হইল। সত্য বটে, উপনিষদের ঋষিগণ বিশ্বব্যাপী দেবতার মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন এবং নানা দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিতেরা দুর্ব্বোধ্য বাদানুবাদের দ্বারা নানা ধর্ম্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু সেই উচ্চ ধর্ম্ম, সেই উচ্চ তত্ত্ব মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। সাধারণ লোক তাহার খোঁজ রাখিত না, অথবা উহা ধারণা করা তাহাদের সাধ্যের অতীত ছিল। ফলে যে সকল ক্রিয়া কর্ম্মের উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় ও অর্থ তাহারা কিছুমাত্র বুঝিত না সেই সমস্তই তাহারা আচরণ করিত। কিন্তু বুদ্ধি দিয়া মানুষ যাহা করে না, সে তাহাতে সুখ পায় না এবং তাহার মন সেই অনাবশ্যক বোঝা ছুঁড়িয়া ফেলিবার জন্যই বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

সেই সুদূর অতীতকালে ভারতবর্ষে মানবচিত্ত একদা এমনই বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সাধকশ্রেষ্ঠ গৌতম বুদ্ধ এই বিদ্রোহীদের অন্যতম। লোকে তাঁহাকে বেদবিরোধী বলিয়া নাস্তিক আখ্যা দিল, তিনি সেই নিন্দার মুকুট পরিয়াই বিদ্রোহের পতাকা দৃঢ় হস্তে ধারণ করিলেন। তিনি উচ্চ তত্ত্ব ছাড়িয়া সোজা কথায় সত্য প্রচার করিয়া লোকের মন জয় করিয়া লইলেন। ছোটবড় সকলকে স্নেহকণ্ঠে নিজের কাছে ডাকিয়া ধর্ম্মের উদার ক্ষেত্র দেখাইয়াছিলেন। তিনি তত্ত্বও বলেন নাই, শাস্ত্রও বলেন নাই; বলিয়াছেন তাঁহার অন্তরের উপলব্ধ সহজ সত্য। তাহা অনাবৃত, অবিকৃত সত্য বলিয়াই সর্ব্বজনের গ্রহণযোগ্য। এই

জন্য তাঁহার ধর্ম্ম কতিপয় পণ্ডিতের ধর্ম্ম হইল না ; সকল দেশের, সকল মানবের ধর্ম্ম হইল। ভারতবর্ষের চিত্ত বহুকাল পরে একটি অমৃত উৎসের রস পাইয়া সজীব হইয়া উঠিল।

এই প্রাণের ক্রিয়া সকল দিক দিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। একমাত্র ধর্ম্ম নহে—শিল্পে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, স্থাপত্যে, সকল দিকেই দেশ উন্নত হইয়াছিল। গৌতমবুদ্ধ ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বয়ং একটি নূতন ধর্ম্মস্থাপনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এমন কথা যদি কেহ মনে করেন তিনি নিঃসন্দেহ ভুল করিবেন। তাঁহার অপূর্ব্ব জীবনের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে জানা যায় যে, তিনি এদেশের সকল শাস্ত্র, পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়াছেন, গুরুদের শরণাপন্ন হইয়া নানা সাধনার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, শ্রেয়ের সন্ধানে দেশে দেশে, বনে, পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে আরও অনেকে এইরূপ পরিব্রাজকরূপে ধর্ম্মসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ বুদ্ধের মতানুবর্ত্তীদের "শাক্য পুত্রীয় শ্রমণ" নাম দিয়া শাস্ত্রমধ্যে এক পার্শ্বে একটু ঠাঁই দিয়াছেন। ইহা হইতেই এ কথা বোঝা যায় যে, হিন্দুশাস্ত্রকারগণের মতেও গৌতমবুদ্ধ এমন কিছু অন্যায় করেন নাই যে, তাঁহাকে একান্ত উপেক্ষনীয় বলিয়া তাঁহারা ত্যাগ করিতে পারেন। হয়তো শাস্ত্রকারগণের মতে বুদ্ধ নূতন কিছু করেন নাই। এক হিসাবে এ কথা মানিয়া লওয়া যায়। যেহেতু সহজ সত্য চিরকালই এক, কিন্তু সেই সহজ সত্যই মানুষ বারংবার ভুলিয়া যায়। বুদ্ধ সেই বিস্মৃত সত্য সরল হৃদয়স্পর্শী কথায় বলিয়াছেন। পুঞ্জীভূত ক্রিয়াকর্ম্মের আবর্জ্জনা উড়াইয়া দিয়া লোককে সত্যের উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি সমাজে, শাস্ত্রে, আচারে, অনুষ্ঠানে কোথাও সত্যের দেখা না পাইয়া পাগল হইয়া সত্যরত্ন উদ্ধারের জন্য সুখভোগ, রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সত্যধন লাভ করিয়াই বুদ্ধ হইয়াছিলেন।

অনুগামী শিষ্যদের কাছে তিনি তাঁহার সত্যসাধনার এই

কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। লোকের প্রতি অনুকম্পা করিয়া, বহুজনের হিতকামনায় তিনি তাঁহার উপলব্ধ সত্য সোজা কথায় সর্ব্বজন সমক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ লোক সাধারণকে চক্ষুষ্মান্ করিল, অমৃত দুন্দুভি শ্রবণ করাইল। যাহা কোনকালে শুনে নাই লোক সাধারণ এমন মধুর ধর্ম্মবাণী শুনিয়া নূতন প্রাণ লাভ করিল। তাঁহার সেই সত্যবাণী মন্ত্র হইয়াছে, তাঁহার সেই কাহিনীই উত্তরকালে শাস্ত্র হইয়াছে।

প্রাচীন শাস্ত্রকার গৌতম বুদ্ধের জন্য যত ক্ষুদ্র আসনটিই রাখুন না কেন, পৃথিবীর ইতিহাসের ক্ষেত্রে তিনি এমন বৃহৎ স্থান জুড়িয়া রহিয়াছেন যে, সমস্ত পৃথিবী তাঁহাকে প্রীতিপূর্ব্বক আপনার বলিয়া চিনিয়া জানিয়া লইয়াছে। পুরাণে তিনি অবতার বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এমন অবতার হইয়া তাঁহার গৌরব একটুও বাড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অবতার বলিয়া অনেকেই তাঁহাকে অন্তরে স্থান দিতে কুণ্ঠা বোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু মহাপুরুষ বলিয়া সকলেই তাঁহাকে হৃদয় আসনে বসাইয়া ভক্তিপূর্ণ অর্ঘ্যদান করিবেন।

বুদ্ধকে ঘরের কোণে ছোট একটি আসন দিয়া হিন্দুরা তাঁহার ধর্ম্ম ও শাস্ত্র এই দেশ হইতে এমন নিঃশেষে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন যে, এই ধর্ম্ম একরূপ এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল।

কিন্তু সজীব পাদপ যে দিকে আলোক পায় সেই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে। জন্মভূমিতে ঠাঁই না পাইয়া এই ধর্ম্ম বিদেশকেই আশ্রয় করিল এবং তথায় বলিষ্ঠ, স্বাধীন, প্রাণবান্ নরনারীর শ্রদ্ধার আলোকে অপূর্ব্ব বিকাশ লাভ করিল। বুদ্ধের ধর্ম্ম যদি অগভীর হইত, তাঁহার সাধনাতরু যদি ভারতবর্ষের মর্ম্মস্থানে শিকড় প্রবেশ করাইতে না পারিত, তাহা হইলে যখন এদেশ বিদ্রোহী হইয়া এই তরুর শাখা পল্লব কাটিয়া ফেলিয়াছিল, তখন মূলটিও উপাড়িয়া ফেলিত সন্দেহ নাই। এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা হয় নাই এমন নহে কিন্তু মন্দির ভাঙ্গিয়া শাস্ত্র পোড়াইয়া ত এই

চেষ্টা সফল হইতে পারে না ; এই পত্রপল্লবশাখাহীন তরুর মূলটা এদেশের মাটিতে রহিয়াই গিয়াছে।

গৌতম বুদ্ধই সর্ব্বপ্রথমে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, একথা সত্য নহে। তাঁহার প্রাদুর্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই বিরুদ্ধতা দেখা গিয়াছে। নিগ্রন্থ, আজীবক প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলিও বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মের কোনো প্রয়োজনীয়তাই স্বীকার করে না।

এই বেদবিরোধী ক্ষুদ্র বৃহৎ দলগুলির প্রভাব সমস্ত দেশের উপর পরিব্যাপ্ত হইতে পারে নাই, তথাপি দেশের স্থানে স্থানে লোকের চিত্ত বিদ্রোহের তরঙ্গ তুলিয়াছিল। ঐ সকল ক্ষুদ্র দলের নায়কগণ সকলের গ্রহণযোগ্য কোন উন্মুক্ত সার্ব্বভৌম রাস্তা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন নাই। দুই একজন নায়ক একদল লোকের চিত্ত জয় করিয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন, এইমাত্র। গৌতম বুদ্ধের অত্যুজ্জ্বল প্রতিভার আলোক মানবের গন্তব্য পথ প্রকাশিত করিয়া দিয়াছে। তাঁহার, সাধু চরিত্র এমন মাধুর্য্যে মণ্ডিত ছিল যে, তাঁহাকে সকলেই আপনার বলিয়া গ্রহণ করিল, তাঁহার উদারতা এমন বিশ্বব্যাপিনী ছিল যে কোনো লোকই তাঁহাকে আপনার বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিল না। তাঁহার বাণী এমন ঋজু ও মর্ম্মস্পর্শী ছিল যে, তীক্ষ্ম তীরের ফলার ন্যায় উহা যে কোনো শ্রোতারই হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া থাকিত। এখন প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পরেও এই মহাপুরুষের নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধ চরিত্রের পবিত্র-সৌরভ এবং নীতি ও ধর্ম্মের বাণী অসংখ্য নরনারীর চিত্তহরণ করিতেছে। তাঁহারই অপূর্ব্ব মৈত্রী-মূলক ধর্ম্ম ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশের নানা ভাষাভাষীদিগকে ঐক্য-সূত্রে গ্রথিত করিয়াছিল। উদ্ভবকাল হইতে প্রায় পনর শত বৎসর এই সদ্ধর্ম্ম কখনো উজ্জ্বল প্রভায়, কখনো মৃদুমন্দ ভাতিতে ভারতবাসীর চিত্তে আলোক দান করিয়াছে। তাহার-পর সহসা রূপকথার রাজকুমারীর প্রাণের মত কে যেন কেমন

করিয়া সোনা রূপার কাঠি ফিরাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম, বৌদ্ধবিহার এবং বৌদ্ধশাস্ত্র অল্পকাল মধ্যে সমস্তই প্রাণহীন করিয়া দিল। গভীর অন্ধকারে সমস্তই ঢাকা পড়িয়া গেল।

পতন দশায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের পৈতৃক ভিটায় স্থান হইল না। স্বগৃহের পরিত্যক্ত অনাদৃত যুবকের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মকে বিদেশেই ঘর বাঁধিতে হইয়াছে। সেইখানে এই ধর্ম্ম সবিক্রমে সগৌরবে আপন মহিমায় অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ এই ধর্ম্মের গৌরব বিস্মৃত হইল।

যাঁহারা এই মৈত্রীমূলক সদ্‌ধর্ম্মের বর্ত্তমান অভ্যুত্থানের সংবাদ রাখেন তাঁহারা জানেন যে, ধৈর্য্যশীল প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের ভিতর হইতে এই ধর্ম্মের কোনো গ্রন্থ উদ্ধার করিতে পারেন নাই; ভারতপ্রান্তবর্ত্তী নেপাল এবং ভারতের বাহিরে তিব্বত, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চীন ও জাপান হইতে বৌদ্ধশাস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে। নেপাল, তিব্বত, চীন ও জাপানে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম এবং সিংহল ও ব্রহ্মদেশে হীনযান বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত। একই ধর্ম্ম, একই শাস্ত্র দুই সম্প্রদায়ে দুইরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। হীনযান ধর্ম্মগ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম্মের আদিম অবিকৃত চেহারাটি দেখা যাইতে পারে। এই ধর্ম্মশাস্ত্র "ত্রিপিটক" নামে খ্যাত। আমরা সিংহল হইতে এই "ত্রিপিটক" পাইয়াছি। বর্ত্তমানে সিংহলে যে ত্রিপিটক প্রচলিত আছে তাহার পাঠ তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির নির্দ্ধারিত পাঠের সহিত অভিন্ন হইবে বলিয়া মনে হয়। কারণ যখন অশোকপুত্র মহেন্দ্র একদল বৌদ্ধ সাধুসহ পিতার আদেশে সিংহলে ধর্ম্ম প্রচারার্থে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে সিংহল রাজ তিস্‌স বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সিংহলে এই ধর্ম্ম স্থাপন করেন। যে সকল বৌদ্ধসাধু মহেন্দ্রের অনুগমন করিয়াছিলেন তাঁহারা কেহ কেহ হয়ত তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিতে যোগদান করিয়া থাকিবেন। ইহার দেড়শত বৎসর পরেই পালি পিটক-

গুলি হস্তাক্ষরে গ্রন্থাকারে লিখিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সময়েই এই ধর্ম্ম সিংহলে প্রচারিত হইয়াছিল এবং তখন সাধুদের স্মৃতিতেই এই ধর্ম্ম যথাযথ ভাবে মুদ্রিত ছিল, সুতরাং সিংহলী ত্রিপিটককে অসঙ্কোচে পণ্ডিতেরা প্রামাণ্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। এই ত্রিপিটকেই বুদ্ধের বাণী অবিকৃত আকারে লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া মনে হয়। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণলাভের দুই এক শত বৎসর মধ্যে ত্রিপিটক গ্রথিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে তাঁহার জীবন ও বাণী যে ভাবে পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ অতিরঞ্জিত মনে করিবার কারণ নাই। অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক হইয়াও বুদ্ধ দেশপ্রচলিত ভাষাতেই ছোটবড়, পণ্ডিতমূর্খ সকলের নিকট তাঁহার ধর্ম্মকাহিনী বিবৃত করিতেন, সুতরাং প্রাকৃত পালিভাষায় লিখিত ত্রিপিটকে বুদ্ধের উক্তি যথাযথ ভাবেই লিখিত হইয়া থাকিবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার হেতু নাই।

বুদ্ধের জীবিতকালের ও তাঁহার আবির্ভাবের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বহুশত বৎসরের ইতিহাসের বিস্তর উপকরণ এই ত্রিপিটকে পাওয়া যায় বলিয়া ত্রিপিটকের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। যাঁহারা বুদ্ধের ও বৌদ্ধধর্ম্মের আদিম অবিকৃত মূর্ত্তি দেখিয়াই তৃপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা কেহ কেহ মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মকে হীনযান বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা হীন বলিতে চাহেন। তাঁহাদের সহিত সকলে একমত হইতে পারিবেন এমন আশা করা যায় না।

মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্রে বৌদ্ধধর্ম্মের একটি আশ্চর্য্য পরিণতি দেখা যায়। মহাযান বৌদ্ধেরা বুদ্ধের মুখের কথাগুলি যথাযথ আকারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন নাই কিন্তু তাঁহাদের সাধকগণ সাধনার অমৃতরস সেচনে সেই মূলবীজগুলিকে পত্রিত, পুষ্পিত বৃক্ষে পরিণত করিয়াছেন। সেই পরিণতির ইতিবৃত্তের মধ্যে সামাজিক রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্তের উপকরণ না থাকিতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে সাধনার ক্রমবিকাশ উজ্জ্বল আকারে প্রস্ফূর্ত্ত

হইয়াছে। ললিত বিস্তরে বুদ্ধের সাধনার ইতিবৃত্ত যেমন সুপরিস্ফুট হইয়াছে, তেমন সুস্পষ্ট বর্ণনা অন্যত্র দেখা যায় না।

মহাযান সম্প্রদায় আদিম বুদ্ধবাণীকে মূলধন করিয়া নানাদিক দিয়া খাটাইয়া, বাড়াইয়া প্রাণেরই পরিচয় দিতেছেন। ইহাতে হয় তো স্থানে স্থানে লোক্সান হইয়া থাকিবে, কিন্তু সে ক্ষতি এড়াইবার উপায় নাই। কারণ ঘরের পুঁজি লইয়া ব্যবসায়ে নামিলে লাভ লোক্সানের ঝুঁকি থাকিবেই। সুতরাং মহাযানদের শাস্ত্রে অতিরঞ্জন দেখিয়া বিস্মিত হইলে চলিবে না। তাহাদিগের সমাজে, সাধনায় ও শাস্ত্রে মৃত্যুর দুর্লক্ষণ নাই, নানাদিকে জীবনের আবেগই দৃষ্ট হইয়া থাকে; প্রাণের আনন্দলীলা নিরন্তর হিল্লোলিত হইতেছে। বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যাপ্তি ও পরিণতির ইতিবৃত্ত অতীব কৌতূহলাবহ।

কেবল মাত্র ধর্ম্মসাধনার দিক হইতে নহে, ঐতিহাসিকতার দিক হইতেও বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই শাস্ত্রের মধ্যে প্রাচীন ভারতের সভ্যতার উজ্জ্বল চিত্র দৃষ্ট হয়। সেই প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের বাহ্য আকার, রাষ্ট্রীয় বিভাগ, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল বৌদ্ধশাস্ত্রে নানাস্থানে তাহার সুস্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্রের আকর হইতে প্রতিদিন পণ্ডিতেরা নিত্য নূতন রত্ন আহরণ করিতেছেন।

বৌদ্ধশাস্ত্র বা ত্রিপিটক মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত। বিনয়, সূত্র, অভিধর্ম্ম। বিনয় পিটকে সঙ্ঘের ইতিবৃত্ত বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। বিনয়ের পাঁচ ভাগ আছে; পারাজিক, পাচিত্তীয়, মহাবগ্‌গ, চুল্লবগ্‌গ, পরিবার।

বৌদ্ধসঙ্ঘ প্রাচীন ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী জনসঙ্ঘ। বিনয়পিটকে এই সঙ্ঘের অভ্যুত্থান ও নানা পরিবর্ত্তনের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। পাতিমোক্‌খ সুত্তবিভঙ্গের অন্তর্গত। এই গ্রন্থখানিকে প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থ বলা হয়। পাতিমোক্‌খ গ্রন্থে প্রায়শ্চিত্তের বিধানগুলি সূত্রাকারে গ্রথিত

আছে। সূত্রবিভঙ্গে নানা অপরাধ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধান বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

প্রত্যেক পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে বৌদ্ধদের সম্মিলনীতে সূত্রবিভঙ্গ পঠিত হইত। বৌদ্ধ সাধুদের এই পাক্ষিক সভাগুলির একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, সমবেত ভিক্ষুসঙ্ঘের সম্মুখে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ তাঁহাদের কৃত ক্ষুদ্র বৃহৎ পাপগুলি অকপটে স্বীকার করিতেন এবং পাপগুলির নিমিত্ত কোনো-না-কোনো প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতেন। এই সভার প্রয়োজনের নিমিত্ত পাতি-মোক্খের প্রায়শ্চিত্তবিধি সূত্রাকারে বিরচিত হইয়াছিল। গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং এই সূত্রগুলির আবৃত্তি করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এই উক্তির সমর্থনের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। পালি বৌদ্ধশাস্ত্র এক মাত্র ভাবে নহে, ভাষায়ও ভগবান্ বুদ্ধের উক্তি বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। কারণ ভগবান্ বুদ্ধ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া যখন তাঁহার সুচিন্তিত ধর্ম্মমত জনসমাজে প্রচারের জন্য বাহির হইলেন তখন তাঁহার বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর মাত্র। তাঁহার পরে তিনি পঁয়তাল্লিশ বৎসরেরও বেশী কাল জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘকালে তাঁহার মুখের বাণী শিষ্যগণ যথাযথ কণ্ঠস্থ করিয়া থাকিবেন হইাতে সন্দেহ করিবার হেতু নাই। এইজন্যই সূত্রপিটকে কোথায়ও ছাঁটা-কাটা ধর্ম্মমত লিপিবদ্ধ হয় নাই। কোন্ সময়ে, কোথায়, কি কারণে, কাহার নিকট বুদ্ধ তাঁহার ধর্ম্মবাণী ব্যাখ্যা করিয়াছেন প্রত্যেক সূত্রেরই ভূমিকাভাগে তাহার উল্লেখ দেখা যায়। সূত্রপিটকের প্রায় সকল সূত্রেরই বক্তা স্বয়ং ভগবান্ বুদ্ধ। কদাচিৎ তাঁহার প্রধান শিষ্যদের দুই এক জনের নাম দেখা যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের এই ঐতিহাসিক যাথাতথ্য সকল দেশের সুধীবর্গকে এই শাস্ত্রালোচনায় আকর্ষণ করিতেছে, সেই আলোচনার ফলে ভারতের সভ্যতা ও ভারতের মহাপুরুষ বুদ্ধ

পৃথিবীতে এমন অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন। পালি বৌদ্ধশাস্ত্রেও অল্পাধিক অতিরঞ্জন ও বাহুল্য স্থান পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কারণ এই গ্রন্থগুলি সহিষ্ণু বৌদ্ধদের স্মৃতি হইতে সংগৃহীত হইয়া নানা কাল ও সমাজ অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই শাস্ত্রের বাক্যবিন্যাসে ও রচনাভঙ্গীতে সমসাময়িক ও পরবর্ত্তীকালের বিচিত্র ধর্ম্মমতের প্রভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। তথাপি এই শাস্ত্রের নিজস্ব মহিমাময়রূপ ঢাকা পড়িয়া যায় নাই। যুক্তি ও বিজ্ঞান-বাদীদিগের জ্ঞানদৃষ্টি উক্তরূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে ও তাঁহারা এই ধর্ম্মের ও শাস্ত্রের আদর না করিয়া পারিবেন না।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

বুদ্ধ ও সংঘ

বুদ্ধ-শিষ্যের তিনটি আশ্রয় (বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ)। সাধন-জীবনের আরম্ভেই তিনি প্রাণীহিত্যা, চৌর্য্য, ব্যাভিচার, মিথ্যাভাষণ, মদ্যপান, অপরাহ্ণ ভোজন, নৃত্যগীত, মাল্যধারণ, গন্ধদ্রব্যলেপন, কোমল-শয়ন এবং স্বর্ণরোপ্য-প্রতিগ্রহ—এই দশটি বর্জ্জনের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই দশটি "শীল" তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করেন। দুঃখমোচনের নিমিত্ত বুদ্ধ-শিষ্য এই যে সাধনা গ্রহণ করেন, ইহা গভীর সংযমের সাধনা।

লোকশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ স্বয়ং এই দুঃখমুক্তির সাধনা আপন জীবনে আচরণ করিয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধিলাভের পরে দীর্ঘকাল তাঁহার এই সদ্‌ধর্ম্মের অমৃতবাণী লোকসমাজে প্রচার করিয়া আপন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। শিষ্যদিগকে তিনি পদে পদে সংযমের সূত্রে বাঁধিতেন, তথাপি দলে দলে লোক তাঁহার শরণ লইয়াছিল কেন? বুদ্ধ তাঁহার জীবনে কি লাভ করিয়াছিলেন? এবং তাঁহার পুণ্যপ্রভাব যে মণ্ডলীর সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই মণ্ডলী কোন্ লাভের আশায় সাংসারিক ভোগ-সুখ ত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই অবলম্বন বলিয়া স্বীকার করিল?

মানব জীবনে দুঃখ আছে তাহা একান্ত সত্য; এবং সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য গভীর সংযমের প্রয়োজন রহিয়াছে, ইহাও সত্য। এই অপরিহার্য দুঃখ দূর করিবার জন্য মহাপুরুষ যে

সাধনা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা কি কেবল বাসনা-বিলোপের সাধনা? বোধি লাভ করিয়া তিনি অমৃতমণ্ড পান করিয়াছিলেন। এই নিব্বাণ বা অমৃতলাভের নিমিত্তই তিনি দুঃখের মূলীভূত কারণ এবং তাহার নিবৃত্তির উপায় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি জানিয়াছিলেন,—

"জিঘচ্ছা পরমা রোগা সংখারা পরমা দুক্‌খা" গৃধ্নুতা পরম রোগ এবং রূপবেদনা-সংজ্ঞা সংস্কার-বিজ্ঞান এই প্রত্যয়জ পদার্থগুলি পরম দুঃখ। দুঃখের তথ্যটি যখন বোধগম্য হয়, তখনই দুঃখের উপশম হয়। ধম্মপদে উক্ত আছে "এতং ঞাত্বা যথাভূতং নিব্বানং পরমং সুখং" এই তত্ত্ব বুঝিয়াই পণ্ডিতেরা পরম সুখ লাভ করেন। ধম্মপদ বলেন,—

আরোগ্য পরম লাভা সন্তুট্‌ঠী পরমং ধনং
বিস্‌সাসা পরমা ঞাতী নিব্বানং পরমং সুখং

"আরোগ্য পরম লাভ, সন্তুষ্টি পরম ধন, বিশ্বাস পরম জ্ঞাতি, নির্ব্বাণ পরম সুখ।"

বুদ্ধ আপনার জীবনে এই পরম সুখ লাভ করিয়াছিলেন। দুঃখোপশমে তিনি এমন সদাপ্রসন্ন, সৌম্যকান্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মুখশ্রী দেখিয়া দর্শকমাত্রের হৃদয়ই শ্রদ্ধায় অবনত হইত। ঋষিপত্তনে আগমনের সংবাদ পাইয়া তাঁহার পঞ্চশিষ্য পণ করিয়াছিলেন, গৌতমকে কিছুতেই গুরু বলিয়া স্বীকার বা সম্মান করিবেন না; কিন্তু তাঁহারা তাহা পারিলেন না। তাঁহার মুখকান্তি দেখিয়াই তাঁহাদের মস্তক আপনা-আপনিই অবনত হইয়াছিল। বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব্বে গৌতম যখন একটি মহাভাবের প্রবল প্রেরণায় অন্তহীন উন্মুক্ত পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রবল সত্যনিষ্ঠা এই পঞ্চ শিষ্যকে আকর্ষণ করিয়াছিল। নৈরঞ্জনা-তীরে উরুবিল্ব বনে তপশ্চর্য্যার সময়ে তাঁহারা গৌতমের সেবা করিয়াছেন। অতঃপর যখন কৃচ্ছ

সাধনা ত্যাগ করিয়া তিনি নিয়মিত পানাহারে প্রবৃত্ত হইলেন, শিষ্যেরা তখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ঋষিপত্তনে গমন করেন।

শিষ্যেরা বিমুখ হইয়া গুরুকে ছাড়িয়াছিলেন বটে, গুরু কিন্তু অমৃতমণ্ড পান করিয়া তাহা একাকী গোপনে সম্ভোগ করিতে পারিলেন না,—ক্ষুধার্ত্ত শিষ্যদের সন্ধানে ঋষিপত্তনে আসিলেন। অনন্যসুলভ মহিমায় মণ্ডিত হইয়া তিনি অমৃত পরিবেশনের নিমিত্ত শিষ্যদের সম্মুখে এমনভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যে, মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাদের মনের অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা শূন্যে মিলাইয়া গেল। তাঁহারা বুদ্ধকে ও ধর্ম্মকে স্বীকার করিয়া নবধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সত্যের পতাকা হস্তে এই যে পঞ্চ বীর সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, ইহাদের নাম কোণ্ডাঞ্‌ঞ (কৌণ্ডিণ্য), ভদ্দীয় (ভদ্রীয়), বপ্পা (বাষ্প), মহানাম ও অশ্বজি (অশ্বজিৎ)।

এই পাঁচটি সত্যানুরাগী সাধককে লইয়া বুদ্ধের আশ্রয়ে আপনা-আপনি যে মণ্ডলীর সূত্রপাত হইল, সেই মণ্ডলীটি একটু বাড়িয়া উঠিয়াই "সংঘ" নাম ধারণ করিল। কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া দানা বাঁধিয়া এই দলটি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল? মহাপুরুষের অন্তর্নিহিত অপার প্রেমই নিঃসন্দেহে এই মিলনের সূত্র। এই প্রেমিক মহাত্মার মধুর ব্যবহারে, মধুর বাক্যে মুগ্ধ হইয়াই, অনুগত শিষ্যেরা পরম সুখ নির্ব্বাণলাভের সাধনা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সংঘের উদ্ভবকালে বুদ্ধের শিষ্যেরা যাঁহাকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি প্রেমবান্ ও মহাপ্রাণ শিক্ষক;—শুষ্ক শাস্ত্র কিংবা বিশুদ্ধ জ্ঞান নহেন। নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির বাণী কি, ব্যবহার কি, মানুষের সহিত এবং সমাজের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কি, লোকশিক্ষক বুদ্ধ এই সকল প্রশ্নের মূর্ত্তিমান সমাধান ছিলেন।

নির্ব্বানের সুখ কি গভীর, কেমন পরিপূর্ণ—তাহা বুদ্ধের

জীবনে একান্ত সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। দেশদেশান্তরের সমস্ত প্রাণীর প্রতি তাঁহার হৃদয়ের যে অসীম করুণা ছিল, সেই করুণাই তাঁহাকে মহাসাধনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল। "সকলের দুঃখ দূর হউক, সকলে সুখী হউক" ইহাই তাঁহার সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। জ্ঞানানলে তিনি অবিদ্যা ভস্মীভূত করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এমন নহে; "জগতের সকল জীব সুখী হউক" এই মৈত্রীভাবনার দ্বারা তাঁহার অন্তর-বাহির নিঃসন্দেহ প্রেমের পুণ্যজ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সাধন-সংগ্রামে এই মৈত্রীবলেই তিনি জয় লাভ করিয়া অমৃত লাভ করিয়াছিলেন।.

"মৈত্রী বলেন জিত্বা পীতো মেহস্মিন্নমৃতমণ্ড"। বিনয়পিটকে মহাবগ্‌গে বোধিলাভের পরে মহাপুরুষ বুদ্ধ তাঁহার নবলব্ধ মহাসত্য কিরূপে সম্ভোগ করিলেন, তাঁহার কিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ সপ্তাহকাল তিনি বোধিদ্রুমমূলে বিমুক্তি সুখ অনুভব করিলেন। দ্বিতীয় সপ্তাহও অজপালের ন্যগ্রোধ-তরুতলে মুক্তির বিমল আনন্দসম্ভোগে যাপন করিলেন। তৃতীয় সপ্তাহে মুচলিন্দতরুমূলে তিনি তাঁহার আনন্দ অমৃতময়ী বাণী ব্যক্ত করিয়া কহিলেন—"যিনি সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট, ধর্ম্ম-জ্ঞাত, যিনি সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন তাঁহার বিবেক সুখকর। সর্ব্বভূতে মৈত্রী ও অহিংসা সুখকর। এই পৃথিবীতে অনাসক্তি ও কামনাহীনতা সুখকর। কিন্তু অহংবোধের বিলোপই পরমসুখ।"* এই উদানটির মধ্যে ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার সাধনার সংক্ষিপ্ত বিবরণই বলিয়া থাকিবেন। তিনি যে সত্যলাভ

---

* সুখো বিবেকো তুট্‌ঠস্‌স সুতধম্মস্‌স পস্‌সতো,
অব্যাপজ্‌ঝং সুখং লোকে পাণভূতেসু সংযমো।
সুখা বিরাগতা লোকে কামানং সমতিক্কমো,
অস্মিমানস্‌স যো বিনয়ো এতং বে পরমং সুখং। (মহাবগ্‌গ)

করিলেন তাহা লোকসমাজে প্রচার করিবেন কিনা পঞ্চম সপ্তাহে এই চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। সংশয় দূর হইবার পরে, তিনি যখন তাঁহার অমৃতমণ্ড সকলকে পান করাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তখন যেন উপনিষদের ঋষির ভাষায়ই বলিলেন,—

"অমৃত দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে; যাহাদের কান আছে, তাহারা শোন। শ্রদ্ধাদ্বারাই এই অমৃতের সাক্ষাৎকার লাভ হইবে।"* এই বাণী ভারতবর্ষের চিরন্তন বাণী বলিয়াই মনে হয়। ধর্ম্মের যে মূলতত্ত্ব তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নিজের নূতন সৃষ্টি বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার নিজের কথায়ই মনে হয়, তিনি যেন হারানো ধন খুঁজিয়া বাহির করিরাছিলেন। সূত্রপিটকে সংযুক্ত নিকায়ে তিনি বলিয়াছেন,—

"পার্ব্বত্যপথে চলিবার সময়ে কোন ব্যক্তি প্রাচীনকালের একটি পথ দেখিতে পাইলেন। সেই পথে প্রাচীনকালে কত লোক যাতায়াত করিত। সেই পথে চলিতে চলিতে তিনি সেকালের একটি পুরী দেখিলেন। মনোহর সে পুরী, তথাকার প্রাসাদ, উদ্যান কুঞ্জ, সরোবর ও প্রাচীরে বেষ্টিত; রমণীয় সেই স্থান। তিনি এখন কি করিবেন? ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে কিংবা রাজমন্ত্রীকে তাহার বক্তব্য নিবেদন করিবেন এবং সেই প্রাচীন পুরী নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিতে অনুরোধ করিবেন। তাহা হইলে সেই নবাবিষ্কৃত প্রাচীন নগর আবার ধনে জনে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। ভিক্ষুগণ! আমিও সেইরূপ একটি প্রাচীন পথ আবিষ্কার করিয়াছি। পুরাকালের মহাজ্ঞানীরা এই পথেই যাতায়াত করিতেন। এই পথে বিহার করিয়া আমি

---

* অপারুতা তেসং অমতস্‌স দ্বারা
যে সোতবন্তো পমুঞ্চন্তু সদ্ধং,
বিহিংসসঞ্‌ঞী পগুণং ন ভাসিং
ধম্মং পণীতং মনুজেসু ব্রহ্মে। (মহাবগ্‌গ)

জন্মমৃত্যুর রহস্য বুঝিয়াছি। আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই ভিক্ষুদের ও শ্রাবকদের নিকট প্রচার করিয়াছি।”

এইখানে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই বোঝা গেল—বুদ্ধ যে ধর্ম্মতথ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন তত্ত্বের দিক দিয়া তাহার মধ্যে তিনি কোনো মৌলিকতারই দাবী করিতে চাহেন না। প্রাচীন সুরায় নূতন পাত্র পূর্ণ করিয়া তিনি ধর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন। কপিল ও পতঞ্জলি প্রভৃতির প্রাচীন ভারতের দার্শনিক পণ্ডিতগণ মহাপুরুষ বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই তাহাদের দার্শনিক নানা মত সুকৌশলে ব্যক্ত করিয়াছেন। তত্ত্বের দিক দিয়া বুদ্ধ তাহাদেরই পন্থা অনুসরণ করিয়া থাকিবেন। তথাপি তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব। পণ্ডিতবর মোক্ষমূলর ধর্ম্ম চক্র-প্রবর্ত্তন সূত্রের ভূমিকায় বলিয়াছেন—“Never in the history of the world had a scheme of salvation been put forth so simple in its nature, so free from any super-human agency,”—“পৃথিবীর ইতিহাসে আর কেহ মুক্তির বাণী এমন সরলভাবে, এমন অতিপ্রাকৃত বর্জ্জন করিয়া বিবৃত করেন নাই।”

পিটক অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতেরা এই মুক্তি বা নির্ব্বাণকে তিনভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। (১) নির্ব্বাণ—শূন্য, বিনাশ, মহাবিনাশ, অহং বোধের বিলোপ-সাধন করিয়া গভীর শূন্যতার মধ্যে নিমজ্জন। (২) নির্ব্বাণ এক পরম রহস্য—স্বয়ং বুদ্ধ ইহার স্বরূপ খোলাখুলি বলেন নাই। (৩) নির্ব্বাণ মানব জীবনের গৌরবময়, সুখকর ও কল্যাণকর পরিণাম। এই সকল বিভিন্ন মতের কোন সমাধান আছে কিনা, তাহার আলোচনা করিবার অধিকার বিশেষজ্ঞ সুধীবর্গেরই আছে সুতরাং সেই আলোচনার দিকে আমরা যাইব না।

সাধারণ বুদ্ধিতেই ইহা মনে হয় যে, বিশেষ একটি আকর্ষণ ভিন্ন মানুষ কোনোখানে দল বাঁধিতে চায় না। মহাপুরুষ বুদ্ধ যখন

তাঁহার নবলব্ধ সত্যপ্রচারের জন্য লোকসমাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার চারিদিকে ধীরে ধীরে দল জমিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গ, তাঁহার চরিত্র, তাহার বাণী মনুষ্যকে নিঃসন্দেহ অতুল আনন্দ দান করিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি মানুষের কাছে ঈশ্বরের নাম করেন নাই, আত্মা-পরমাত্মার জটিল তত্ত্বকে তিনি একেবারে আমলই দিলেন না, অতি-প্রাকৃত কোনো-কিছুর কথা কহিলেন না; অথচ ছোটবড়, উচ্চ-নীচ সকলেই তাঁহার ধর্ম্ম ও সংঘ আগ্রহসহকারে স্বীকার করিল।

সংঘের আদিম শিষ্যেরা তাঁহার কাছে কি পাইলেন? যাহা পাইলেন তাহা আর যাহাই হউক "শূন্য" নহে, "না" নহে। তাহা আশা ও আনন্দ, তাহা অভয় ও অশোক। শিষ্যেরা যাহা পাইলেন তাহা অনির্ব্বচনীয়; এবং তাহা এমন যাহার জন্য তাঁহারা অনায়াসে সাংসারিক সুখভোগ বর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন! ঋষিরা যাহাকে বাক্যের মনের অগোচর বলিয়াছেন, সেই পরম সত্য মহাপুরুষ বুদ্ধের স্তব্ধ-শান্ত উপলব্ধির গোচর হইয়াছিল। এই সত্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বলিতে পারিয়াছেন, "অমৃতের দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে" এবং পৃথিবীর নরনারী এই অমৃতের জন্যই তাঁহার ধর্ম্ম বরণ করিয়াছে!

মহাপুরুষেরা মানবজাতির হৃদয়-সরোবরের প্রস্ফুটিত শ্বেত শতদল। তাঁহারা অম্লান জ্যোতিঃতে মানবহৃদয়ে নিত্যকাল বিরাজ করিতেছেন। মানুষের মনো-ভ্রমর গন্ধ, বর্ণ, মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া এই কমলই আশ্রয় করিয়া থাকে। মহাপুরুষ বুদ্ধ সকল মানবের এমনই আশ্রয়স্থল ছিলেন। সিংহলী কবি মেধাঙ্কর তাঁহার "জিনচরিত" গ্রন্থে এই মহাপুরুষকে "নিব্বানমধুদং" বলিয়াই প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন।

এই নির্ব্বাণমধুলাভ করিবার জন্য ভিক্ষুকে সকল জীবের সুখ

ও কল্যাণ ভাবনা করিতে হইবে। তাঁহাকে বুদ্ধের অনুশাসন প্রসন্ন মনে মানিয়া চলিতে হইবে। এইরূপ জীবন যাপন করিতে করিতে যখন তাঁহার বাসনার উপশম হইবে তখন তিনি সুখকর শাশ্বত নিব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। ধম্মপদে উক্ত লইয়াছে—

মেত্তাবিহারী যো ভিক্‌খু পসন্নো বুদ্ধ সাসনে।
অধিগচ্ছে পদং সন্তং সংখারূপসমং সুখং ॥

নিব্বাণ-মধু বা অমৃতলাভের জন্য বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যকে সাধনার যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহা ইন্দ্রিয়বিজয়ের কল্যাণ-পন্হা। সাধককে প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে সংযত হইয়া পথ চলিতে হয়। এই চলার পথেও তিনি আনন্দ-লাভ করিয়া থাকেন ঃ—

"নিদ্দরো হোতি নিপ্পাপো ধম্মপীতি রসংপিব" ধর্ম্মপ্রীতিরস পান করিতে করিতে সাধক নির্ভীক ও নিষ্পাপ হইয়া থাকেন। নিষ্পাপ হইবার জন্য সাধক যে মানস-সংগ্রাম করেন, সেই সংগ্রামে আনন্দ আছে ; এবং তিনি যখন জয়লাভ করেন, সেই বিজয়গৌরবেও আনন্দ আছে। সাধনপথে প্রত্যহ আনন্দরস পান করিতে করিতে সাধকের চিত্ত বিকশিত হইয়া উঠে, তিনি সকল পাপ পরিহার করিয়া সকল মঙ্গলের অনুষ্ঠান করেন। তিনি যে সুখ লাভ করেন, তাহা ভোগের সুখ নহে, ত্যাগের সুখ, সংযমের সুখ। এই সুখকেই পরম আনন্দ বলিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এই সাধনার শেষেই তিনি "নিব্বানং পরমং সুখং" লাভ করেন। নিব্বাণ ও বিশ্বমৈত্রীর বক্তা ও প্রচারক ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যদিগকে অষ্টাঙ্গিক সাধনা ও ধ্যানের কথা শুনাইয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। তিনি তাঁহার সংঘের ভিক্ষুদিগকে সংঘের নিকটে, লোকসমাজে এবং আপনাদের অন্তরে বাহিরে সত্য হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। বৌদ্ধভিক্ষু এইরূপে সকলদিক দিয়া সত্য হইয়াই পরিণামে বৃহৎ সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

বিনয়-পিটকে ভিক্ষুজীবনের প্রতিপাল্য নিয়মাবলী, আহার

বিহার, বেশভূষা প্রভৃতি সকল বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খুঁটিনাটি এমন বিস্তৃত-ভাবে আলোচিত হইয়াছে যে, সেগুলি কেহ বাহুল্য মনে করিতে পারেন। সংঘের যখন উদ্ভব হইয়াছিল, সেই সুদূর অতীতকালের সহিত আমাদের ঐতিহাসিক যোগসূত্র এমন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে যে, এখন আমরা সকল কথা কিছুতেই বুঝিতে পারিব না। তবে এ কথা সুনিশ্চিত যে, প্রাচীন বৌদ্ধ সংঘের মধ্যে সভ্যতার এমন একটি উজ্জ্বল ছবি দৃষ্ট হয় যে, সে ছবির গৌরব কখনো ম্লান হইবে না।

নির্ব্বাণ বা মুক্তিলাভের বাসনা ছোটবড় পণ্ডিত-মূর্খ সাধু অসাধু, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, আর্য্য-অনার্য্য সকলের মনেই স্বভাবতঃ জাগিয়া থাকে। বুদ্ধ এই জন্য সাধনার পথটি এমন সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন যে, সেখানে কাহাকেও অন্ধকারে হাতড়াইতে হইবে না। তিনি স্বয়ং যাহাদের কাছে ধর্ম্মব্যাখা করিয়াছেন তাহাদের অধিকাংশই অনার্য্য ও অশিক্ষিত। সুতরাং তিনি সোজা কথা, সাধারণের ভাষায় সরস আখ্যান সৃষ্টি করিয়া, শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। শিষ্যেরা যাহাতে কথাগুলি মনে রাখিতে পারে, সেইজন্য তিনি এককথার পুনরুক্তি করিতেও দ্বিধা মনে করেন নাই। এই পুনরুক্তি সুপণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে অনাবশ্যক হইতে পারে কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞানহীন সাধারণ শ্রোতার কাছে তাহা অত্যাবশ্যক ছিল। সংঘে প্রবেশের দ্বার খুলিয়া দিয়া তিনি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই আহ্বান করিলেন। সে আহ্বান যাহাদের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল, তাহারা শোকেতাপে জর্জ্জরিত বলিয়াই তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিল। সংসার ত্যাগ করিয়া সংঘে প্রবেশাধিকার পাইলেই, কেহ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহের হাত এড়াইলেন এমন হইতেই পারে না। তাঁহাকে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে এই সকলের সহিত সংগ্রাম করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে হয়। সাধনার প্রভাবে একদিন বিষয়বাসনা সংযত করিয়া তিনি উপশান্ত হইবেন সন্দেহ নাই। সে দিন তাঁহার দেহ শান্ত, বাক্য শান্ত ও চিত্ত শান্ত হইবে।

কিন্তু এই বাঞ্ছিত জীবনলাভের পূর্ব্বে সংঘের ভিক্ষু সাধারণ

মানুষ মাত্র ; সুতরাং তাহার সাধনার পথের সমস্ত বাধা তাহার নিকটে বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন আছেই। ছোট ছোট দুর্ব্বলতাগুলি মানুষকে কতখানি দুর্ব্বল ও অসহায় করিয়া ফেলে লোক-শিক্ষক বুদ্ধ তাহা সম্যক্ জ্ঞাত ছিলেন বলিয়াই, তিনি গৃহত্যাগী ভিক্ষুকেও আচারে-ব্যবহারে, আহারে-বিহারে কোন দিক্ দিয়া বিন্দুমাত্র অশিষ্ট বা উচ্ছৃঙ্খল হইতে দিতেন না। ভিক্ষুর জীবনে কোন কার্য্যে শিথিলতা বা নিরুদ্যম প্রকাশ পাইবে না। ভিক্ষুকে সংঘের ও সমাজের মধ্যে সর্ব্বত্রই সমভাবে ভদ্র হইতে হইবে।

ধর্ম্মনৈতিক উচ্চ উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুকে বিশেষ করিয়া বলা হইল যে, আর কোন ভিক্ষুর প্রতি দুর্ব্বাক্য ব্যবহার, কাহাকেও নিন্দা করা, কাহারও প্রতি অযথা দোষারোপ, ভিক্ষুমণ্ডলীর সহিত অকারণ বাগ্ বিতণ্ডা বা ছলনা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কাহাকেও সংঘের আবাসস্থান হইতে বহিষ্কৃত করা কিংবা আঘাত করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। যখন অপর ভিক্ষুরা কলহ করেন তিনি আড়ালে থাকিয়া তাঁহাদের বিবাদ শুনিবেন না। কোন কার্য্যের আরম্ভে তিনি সম্মতি দিয়া পরে কখনো তাহাতে আপত্তি তুলিতে পারিবেন না। সংঘের ভিক্ষুরা যখন কোন প্রশ্নের মীমাংসার জন্য সম্মিলিত হইবেন তখন তিনি নিজের মত না জানাইয়া চলিয়া যাইতে পারিবেন না। যাহাতে সঙ্ঘে ভিক্ষুদের ভেদসংঘটন হইতে পারে, তিনি স্বয়ং এমন আচরণ করিবেন না, কিংবা অন্য কাহারো দৃষ্টি তেমন কোন বিষয়ে আকর্ষণ করিবেন না।

সংঘের সমস্ত দ্রব্যাদি সংঘবাসীদের সাধনার সম্পত্তি। সেইগুলি রক্ষার সম্বন্ধে ভিক্ষুকে উদাসীন হইলে চলিবে না। শয্যা, আসন, পীঠ প্রভৃতি কোন জিনিষ যদি তিনি রৌদ্রে বা বাতাসে বাহির করেন, কিম্বা অন্যের দ্বারা বাহির করাইয়া থাকেন, তাহা হইলে, সেগুলি তুলিয়া না রাখিয়া কিম্বা তোলাইবার ব্যবস্থা না করিয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিবেন না। সংঘের অভ্যন্তরস্থ গৃহের শয্যা ও আসনগুলির

উপর ধপাস করিয়া তাড়াতাড়ি শয়ন বা উপবেশন নিষিদ্ধ। এইরূপ করিলে দ্রব্যাদি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সমস্ত গৃহ শ্রীহীন হইবার কথা।

গৃহত্যাগী ভিক্ষুকে তাঁহার বৃহৎ ধর্ম্মপরিবারের মধ্যে এইরূপ সংযত ও শিষ্ট হইতে হইবে। তাঁহার আহার প্রণালীও অশোভন বা অসংযত হইলে চলিবে না। ছোট গোলাকার গ্রাস তুলিয়া তিনি মুখে দিবেন, আহার্য্য দ্রব্য মুখের কাছাকাছি আসিবার পূর্ব্বেই মুখব্যাদান করিবেন না। খাবার জিনিষগুলি সমস্ত হাতে মাখা, সমস্ত হাতটা মুখের ভিতর প্রবেশ করান, গ্রাসগুলি হাতে লইয়া নাড়াচাড়া, খাইতে খাইতে গ্রাসগুলি মুখে পুরিয়া অনাবশ্যক নাড়াচাড়া, গাল ফুলান, আহার সময়ে হাত ঝুলান, ভাত ছড়ান, জিভ্ বাহির করা, হুস্‌হাস্ শব্দ করা, আঙ্গুল, ওষ্ঠ, অধর কিম্বা ভোজন পাত্র লেহন, এবং উচ্ছিষ্ট হাতে জলপাত্র ধারণ নিষিদ্ধ।

জনপদে যাতায়াত বা বাস করিবার সময়েও ভিক্ষুকে সর্ব্বতোভাবে ভদ্র হইতে হইবে। পরিশুদ্ধ বহির্ব্বাস ও অন্তর্ব্বাস দ্বারা তিনি সকল অঙ্গ আবৃত করিবেন, তাঁহার হাঁটু ও নাভি দেখা যাইবে না, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযত হইবে ও তিনি অধোদৃষ্টিতে রহিবেন। কি চলিবার সময়ে, কি স্থিরভাবে অবস্থান সময়ে—তিনি কখনও উচ্চহাস্য করিতে পারিবেন না, এবং মৃদু কণ্ঠে কথা কহিবেন। তাঁহার পক্ষে এই সময়ে, শরীর, মস্তক ও বাহু দোলান নিষিদ্ধ। কটিদেশে হাত রাখিয়া, কিম্বা মস্তকে অবগুণ্ঠন দিয়া তিনি জনপদে বিচরণ করিতে পারিবেন না।

লোকালয়ে নরনারীর সম্মুখে তিনি সোজা হইয়া বসিবেন; কাৎ হইয়া চিৎ হইয়া বা জানুর উপর চীবর তুলিয়া বসিবেন না। তাঁহাকে পিণ্ডপাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আদরপূর্ব্বক প্রয়োজনানুরূপ আহার্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। যাহাতে পিণ্ডদাতা গৃহীর অসুবিধা ঘটিতে পারে, কিম্বা ভিক্ষুর মুখরোচক উপাদেয় আহার্য্য গ্রহণের প্রতি লালসা প্রকাশ পাইতে পারে—ভগবান্ বুদ্ধ এমন অসংযত

ব্যবহারের কদাচ প্রশ্রয় দিতেন না। নিয়ম আছে, সুস্থকায় ভিক্ষুরা পান্থশালায় একবেলামাত্র আহার করিতে পারিবেন। দিবা দ্বিপ্রহরের পরে পিণ্ডগ্রহণ নিষিদ্ধ। দল বাঁধিয়া পাঁচ ছয় জনে কাহারো গৃহে ভিক্ষায় যইবেন না। গৃহী যেমন ভাবে যাহার পরে যাহা খাইতে দিবেন, ভিক্ষুরা তেমনি আহার করিবেন। "আগে ইহা চাই" এমন ভাবে ফরমাস করিতে পারিবেন না। সুস্থকায় ভিক্ষু কখনো মধু, নবনীতাদি চাহিয়া খাইতে পারিবেন না। কোন ভিক্ষু ভোজন সমাপ্ত করিবার পরে অন্য কোন ভিক্ষু তাঁহাকে আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন না। সময়ান্তরে আহার করিবার জন্য ভিক্ষু কোন খাদ্যদ্রব্য সরাইয়া রাখিতে পারিবেন না। কোনো গৃহী ভিক্ষুকে যত খুসী আহার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেও, তিনি দুই তিন পাত্রের বেশী লইবেন না। ঐ খাদ্য অন্য ভিক্ষুদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবেন। কোন ভিক্ষু ভোজবেলায় বলপূর্ব্বক কোন গৃহীর ঘরে প্রবেশ করিবেন না।

ভিক্ষুরা যেখানে-সেখানে যাকে-তাকে বিনা প্রয়োজনে উপদেশ দিয়া বেড়াইবেন—লোকশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের অনুশাসন তেমন হইতেই পারে না। যে ব্যক্তি বিলাসে মগ্ন, উপদেশ পাইবার নিমিত্ত যাহার মনে আগ্রহ জাগিয়া উঠে নাই, অথবা যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহাকে ধর্ম্ম কথা শুনান নিষিদ্ধ। ভিক্ষু কখনো ছত্রধারী, যষ্টিধারী, অস্ত্রধারী পাদুকাপরিহিত, যানারোহী, শায়িত, হেলান দিয়া উপবিষ্ট, উষ্ণীষধারী কিম্বা রোগী ব্যক্তিকে ধর্ম্মোপদেশ দিবেন না। পথিমধ্যে ধর্ম্মকথা শুনান বিধেয় নহে।

ছোট বড় এমন অনেক বিধিনিষেধ বৌদ্ধ ভিক্ষুকে মানিয়া চলিতে হইত। বৌদ্ধ গৃহী বা শ্রাবকেরও প্রতিপাল্য নিয়মের অভাব নাই। বৌদ্ধসাধনা বাসনা বর্জ্জনের সাধনা হইলেও প্রকৃত বৌদ্ধ ঘরে-বাহিরে, বিহারে-জনপদে কোনোখানেই শিষ্টতা, ভদ্রতা ও লৌকিকতা বর্জ্জন করিতে পারেন না। বৈরাগ্যের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়া তিনি যদি সংসারের সাধারণ লোকের সুখ

সুবিধা উপেক্ষা করিয়া, সমাজের উপদ্রবের কারণ হন, তাহা হইলে তিনি অপরাধী বলিয়া গণ্য হইতেন।

বৈরাগ্যের সাধক হইলেও বুদ্ধ-শিষ্যের আচরণে কোন শিথিলতা, অশিষ্টতা ও জড়তা স্থান পাইত না। ইহারই ফলে সংঘের মধ্যে যে অপূর্ব্ব সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল, তাহা এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। বুদ্ধ-শিষ্যদের শিক্ষণীয় শিষ্টতা এক্ষণে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অস্পষ্ট অন্ধকার মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া থাকিলেও উপেক্ষনীয় নহে।

তৃতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধবিধি ও সঙ্ঘের প্রকৃতি

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস একান্ত বিচ্ছিন্ন হইলেও একথা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত যে, ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক যুগের সূচনাকালেই ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার উদার ধর্ম্মদ্বারা আর্য্য ও অনার্য্য দ্বন্দ্বের সমাধান করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন; অথবা তাঁহার সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের পুণ্যপ্রভাব আপনা আপনি বিবাদরত আর্য্য-অনার্য্যদিগের মনোমালিন্য দূর করিতেছিল।

বুদ্ধের ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র ইহাই সর্ব্বপ্রথমে দেখা যায় যে, ধর্ম্মের মিলন-মন্দিরের চারিদিকে তিনি কৃত্রিম প্রাচীর তুলিয়া বাধার সৃষ্টি করেন নাই। এই জন্য আর্য্য অনার্য্য প্রত্যেকেই বলিতে পারিল "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি," বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ জাতিবর্ণনির্ব্বিচারে সকলের আশ্রয় হইল। বুদ্ধের বাণী কেবল উচ্চবর্ণের কতিপয় পণ্ডিতের উপভোগ্য হইল না, সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর পতিতেরাও ইহার ভাগ পাইয়াছিল। ফলে এই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া প্রাচীন ভারতে যে জাগরণ দেখা গিয়াছিল সেই জাগরণ সাম্প্রদায়িক নহে—উহাতে সকল দেশই জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেই জাগরণ শিল্পবিজ্ঞান, সাহিত্যদর্শন, সমাজরাষ্ট্র সব দিকেই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল।

বুদ্ধ যে মুক্তির বাণী প্রচার করিলেন তাহা অনার্য্যের কর্ণগোচর না হইলে ক্ষৌরকার উপালী ধর্ম্মশাস্ত্রের বক্তা ও ব্যাখ্যাতা হইতে পারিতেন না এবং পতিতা বারাঙ্গনা আম্রপালী ভিক্ষুণীর

শিরোমণি হইতেন না। স্থবির শীলবানের মুখে আমরা এই আশ্চর্য্য বাণী শুনিলাম যে, তিনি চণ্ডাল হইয়াও এই ধর্ম্ম-প্রভাবে সকল মানবের পূজনীয় হইতে পারিয়াছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধের ধর্ম্মে ও সঙ্ঘে সাম্যের এই ছাপ বাহির হইতেই দেখা যাইতে পারে।

বৌদ্ধসাধনা দুঃখ নিবৃত্তির সাধনা। এই জন্য ভগবান্ বুদ্ধ মৈত্রী ও মঙ্গল গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। মৈত্রীভাবনার দ্বারা মানুষের মন উদার ও প্রসন্ন হইয়া থাকে, ইহা নিঃসন্দেহ সত্য কথা। "সমুদয় পুরুষ, সমুদয় স্ত্রী, সমুদয় অনার্য্য, সমুদয় দেবতা, সমুদয় মনুষ্য, সমুদয় অমনুষ্য, সমুদয় প্রেতপিশাচ নরকের জীব শত্রুহীন হউক, বিপদহীন হউক, রোগহীন হউক।" এই প্রকার ভাবনার মধ্যে মনটিকে ডুবাইয়া রাখিলে মন ক্রমশঃ সকল গ্লানি, পাপতাপ হিংসাদ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সকল আর্য্য ও অনার্য্যকে বুদ্ধ এই ভাবনার মন্ত্র দান করিয়াছেন এবং এই মৈত্রীর মন্ত্র তিনি কৃপণের ধনের মত সম্প্রদায়ের সিন্ধুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া এই কথা কাহাকেও বলেন নাই যে পুণ্যমন্ত্রে ইহার অধিকার আছে, ইহার অধিকার নাই। তাঁহার এই মৈত্রীর মন্ত্রই সঙ্ঘের সৃষ্টির মূলে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিবে। এই মৈত্রী মন্ত্রের উদারতা ও সাম্য বৌদ্ধ সঙ্ঘকে মঙ্গল-শ্রী দান করিয়াছিল।

বুদ্ধশিষ্যের ভাবনা যেমন মৈত্রী, অনুষ্ঠান তেমনি মঙ্গল। এই মঙ্গলকে বুদ্ধশিষ্য তাহার জীবনের প্রধান পাথেয় বলিয়া জানেন। এই মঙ্গলকে তিনি অঙ্গের অলঙ্কার করিয়া নির্ভয়ে সংসারে বিচরণ করিয়া থাকেন। এই মঙ্গল অর্থাৎ শীল প্রতিপালন দ্বারা তিনি তাঁহার প্রাত্যাহিক জীবন সংযত ও সুন্দর করিবেন। এই শীলই তাহার নির্ব্বাণ বা অমৃতপুরে প্রবেশের দরজা।

মঙ্গলকে যিনি স্বীকার করেন, তাহাকে একমাত্র আপনার সুখ ও সুবিধার দিকে চাহিলে চলে না। কারণ যাহা একের পক্ষে মঙ্গল অন্যের পক্ষে মঙ্গল নহে, তাহা প্রকৃত মঙ্গলই নহে। যাহা আজ

মঙ্গল এবং চিরকাল মঙ্গল, যাহা একজনের মঙ্গল এবং সকলের মঙ্গল, তাহাই প্রকৃত মঙ্গল। মঙ্গল কি তাহা বুঝিবার জন্য কাহাকেও ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না, সাধারণ সোজা বুদ্ধি দিয়াই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ভগবান্ বুদ্ধ এই মঙ্গলকেই প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন বলিয়া মানুষের সাধারণ বুদ্ধি তাঁহার ধর্ম্মকে স্বীকার করিতে কোনপ্রকার বাধা অনুভব করে নাই।

বৌদ্ধ সঙ্ঘে শ্রমণ ও শ্রামণেরদিগকে এত যে বিধিনিয়ম মানিয়া চলিতে হয় সেখানেও দেখা যায় যে, সেই বিধিনিয়মগুলির দ্বারা মঙ্গলশ্রী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়া থাকে। ভাল হইয়া উঠিবার জন্য মানুষকে স্বেচ্ছায় যাহা মানিতে হয় ["প্রাণী বধ করিব না," "ব্যভিচার করিব না," "মিথ্যা কহিব না," "সুরাপান করিব না" ইত্যাদি] শীলগুলি তেমই সহজবিধি। অথচ প্রাত্যহিক জীবনে মানুষ এই সোজা কথাগুলি ভুলিয়া যায়। এইজন্য এই সোজা নীতিগুলিও বারংবার স্মরণ করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সুতরাং এই শীলগুলি মানিয়া চলিলে কাহারো স্বাধীনতা খর্ব্ব হইতে পারে না, পরন্তু ব্যক্তিগত স্বেছাচার দূর হইলে সকল মানুষের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার কথা।

সাধনার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ সাধকের স্বাধীনতা কোনদিকে বিন্দুমাত্র খর্ব্ব হয় নাই—কারণ তিনি আপনি আপনার অবলম্বন এবং আপনার বীর্য্যকে ও শক্তিকে জাগাইয়া তুলিয়া তিনি আপন অধ্যবসায় বলেই নির্ব্বাণলাভ করেন। সঙ্ঘের মধ্যেও এই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। প্রবীণ নবীন ভিক্ষুদিগের প্রতিপাল্য নিয়মের যতই বাহুল্য থাকুক না কেন সেখানেও মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি অসামান্য শ্রদ্ধাই দেখানো হইয়াছে। সঙ্ঘের নিম্নতম নবীন ভিক্ষুও কোন কারণে অনাদৃত হইতেন না। প্রত্যেক ভিক্ষুর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই বিধি হইয়াছে—

(১) কোন ভিক্ষু ঈর্ষা বা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অন্য কোন দোষ অযথা আরোপ করিলে অপরাধী হইবেন।

(২) এক ভিক্ষু অপর কোন ভিক্ষুর অনুপস্থিতিকালে তাঁহার অসুবিধা ঘটাইবার অসদভিপ্রায়ে তাঁহার বাসস্থান অংশতঃ অধিকার করিলেও অপরাধী হইবেন।

(৩) এক ভিক্ষু অপর কোন ভিক্ষুর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সংঘ হইতে তাড়াইয়া দিলে অপরাধী হইবেন।

(৪) এক ভিক্ষু অপর কোন ভিক্ষুর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আঘাত করিলে কিংবা ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে অঙ্গভঙ্গী করিলে অপরাধী হইবেন।

(৫) এক ভিক্ষু অপর কোন ভিক্ষুর মনে ধর্ম্মবিষয়ে সংশয় জন্মাইয়া দিলে অপরাধী হইবেন।

সংঘ মধ্যে কোন ভিক্ষু বিনা কারণে অন্যকর্ত্তৃক যাহাতে নিন্দিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত কিম্বা উপদ্রুত না হইতে পারেন তাহারই জন্য উল্লিখিত বিধিগুলি প্রণীত ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পরন্তু যিনি ভিক্ষুরূপে সংঘে স্থান পাইয়াছেন সংঘের প্রত্যেক সাধারণ অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ রহিয়াছে। বৌদ্ধ সংঘের বিধিব্যবস্থাগুলি পাঠ করিলে ইহা অনায়াসেই দেখা যায় যে, সংঘের ভিক্ষু সংঘকেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মানিয়া চলিতেন, অপর কোন শক্তিশালী ভিক্ষুর শাসন তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইত না। গণতন্ত্রতার বিধান অনুসারেই সংঘের সাধারণ কর্ত্তব্যগুলি নিষ্পন্ন হইত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ উপসম্পদাগ্রহণের বিধি আলোচিত হইতে পারে। কোন নবীন ভিক্ষু উপসম্পদাগ্রহণের প্রার্থী হইলে সংঘ তাঁহাকে উপদেশ দিবার জন্য একজন শ্রমণ নিযুক্ত করিবেন। উপদেষ্টা ভিক্ষু সংঘের সম্মুখে বিজ্ঞপ্তি করিবেন—"মাননীয় ভিক্ষুগণ, অমুক ব্যক্তি উপসম্পদাগ্রহণের ইচ্ছা করিয়াছেন, সংঘ যদি সম্মতি প্রদান করেন আমি তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিতে পারি।" দীক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হইলে উপদেশক সংঘের সম্মুখে নিবেদন করিবেন—"মাননীয় ভিক্ষুগণ, দীক্ষার্থী অমুক ভিক্ষুকে আমি যথাবিহিত উপদেশ দিয়াছি, আপনাদের অনুমতি হইলে তাঁহাকে

আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি।" সঙ্ঘের সম্মতি পাইয়া দীক্ষার্থী যথাযোগ্য বসন পরিধান করিয়া সম্মিলিত ভিক্ষুদের সমীপে যুক্তকরে নিবেদন করিবেন—"মাননীয় ভিক্ষুগণ, আমি উপসম্পদাগ্রহণের ইচ্ছা জানাইতেছি, অনুকম্পা করিয়া আমাকে উপসম্পদা দান করুন।" দীক্ষার্থী তিনবার এইরূপ বিজ্ঞপ্তি করিয়া থাকেন। অতঃপর তাঁহার উপদেষ্টা বলিবেন—"মাননীয় ভিক্ষুগণ, আমার নিবেদন শ্রবণ করুন, অমুক ব্যক্তি অমুক ভিক্ষুর নিকট উপসম্পদাদীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন, আপনাদের অনুমতি হইলে আমি দীক্ষার্থীকে এই দীক্ষা গ্রহণের সম্বন্ধে যাহা বাধা আছে একে একে সেইগুলি জিজ্ঞাসা করি।" সঙ্ঘ অনুমতি প্রদান করিলেন; তখন উপদেষ্টা একে একে প্রশ্ন করিলেন।

প্রশ্নোত্তর হইতে ভিক্ষুগণ জানিতে পারিলেন যে, দীক্ষার্থীর কুষ্ঠ, গণ্ড, শ্বেত, শ্বাস কিম্বা অপস্মার প্রভৃতি রোগ নাই; তিনি স্বাধীন এবং অঋণী; তিনি রাজ্যভৃত্য অথবা ক্রীতদাস নহেন; তাঁহার বয়স বিশবৎসর পূর্ণ হইয়াছে এবং গৃহত্যাগের সময়ে তিনি মাতাপিতার অনুমতি পাইয়াছেন।

এইরূপে সঙ্ঘের ভিক্ষুরা যখন দীক্ষার্থীর সম্বন্ধে তাহাদের সকল জ্ঞাতব্য জানিয়া প্রসন্ন হইলেন তখন নবীনভিক্ষু উপসম্পদা প্রাপ্ত হইয়া সঙ্ঘমধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করেন এবং ভিক্ষুর পূর্ণ অধিকার লাভে সমর্থ হন।

দীক্ষাগ্রহণের সময়েই নবীন ভিক্ষু সঙ্ঘের সম্মিলিত ভিক্ষুগণের নিকটে প্রণত হইয়া সঙ্ঘকে স্বীকার করিয়া লইয়া থাকেন। বুদ্ধ তাঁহার কাছে যেমন সত্য, ধর্ম্ম তাঁহার কাছে যেমন সত্য, সঙ্ঘও তেমনি সত্য।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বৌদ্ধ বিহারে সংসার-ত্যাগী ভিক্ষুরা গণতন্ত্রতাকে এমন করিয়া সম্মান করিতেন। অধুনা সুসভ্যজাতিসমূহদের মধ্যে যেমন "Voting by ballot" অর্থাৎ ছোট ছোট গোলক বা টিকেট দ্বারা ভোট লইয়া বিচার

করিবার রীতি দেখা যায় ; প্রাচীন বৌদ্ধ সঙ্ঘে সেইরূপ সম্বহুলতার বিচার প্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল। বিচারের জন্য ভিক্ষুরা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের শলাকা ব্যবহার করিতেন এবং শলাকা গণনা দ্বারাই মতবাহুল্য নির্ণীত হইত।

কখন কোনো জটিল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য সঙ্ঘের ভিক্ষু-দিগের মত গ্রহণের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, তখন ভিক্ষুদের মধ্যে কোন সুযোগ্য ব্যক্তি যথারীতি প্রস্তাবিত, অনুমোদিত হইয়া শলাকা-গ্রহীতা বিচারপতি মনোনীত হইতেন। যিনি অপক্ষপাত, অদ্বেষ্টা, বুদ্ধিমান ও নির্ভীক নহেন তিনি কদাচ এমন সম্মানজনক পদ লাভ করিতে পারিতেন না। ভিক্ষুরা সাধারণতঃ মৌনাবলম্বন দ্বারাই সম্মতি জানাইতেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের এই বিচার প্রণালী আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তাহারা কাহারো ব্যক্তিগত মতকে উপেক্ষা করিতেন না। সঙ্ঘের সর্ব্ববিধ সাধারণ প্রশ্নের সহিত প্রত্যেকে ভিক্ষুর ব্যক্তিগত যে যোগ ছিল সেই যোগ সাম্য ও স্বাধীনতারই পরিচায়ক। এই যোগ স্বেচ্ছায় ছিন্ন করিবার সাধ্য কাহারো ছিল না। পরন্তু এই স্বেচ্ছাচার অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইত। এই জন্যই বিধি হইয়াছে ঃ

(১) সঙ্ঘ যখন কোনো বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত আছেন তখন আপনার মত প্রকাশ না করিয়া কোন ভিক্ষু চলিয়া যাইতে পারিবেন না।

(২) কোনো কার্য্যের আরম্ভকালে সম্মতি দিয়া কোন ভিক্ষু পরে ঐ কার্য্যের আর আপত্তি করিতে পারিবেন না।

(৩) সঙ্ঘ কোনো বিষয়ের যে মীমাংসা করিয়াছেন কোনো ভিক্ষু সেই মীমাংসার বিরুদ্ধে আন্দোলন তুলিতে পারিবেন না।

সামাজিক বাধা তুলিয়া দিয়া উচ্চনীচ আর্য্য অনার্য্য সকলে মিলিত হইয়া বুদ্ধের পবিত্র ধর্ম্মের আশ্রয়ে সঙ্ঘমধ্যে যে আশ্চর্য্য সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল এক সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার সুফল লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

বৌদ্ধ সংঘ ও জনসাধারণ

বিনয়পিটকের পাতিমোক্‌খভাগে বৌদ্ধভিক্ষুদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিপাল্য নিয়মবলী লিপিবদ্ধ আছে। সেইগুলি পাঠ করিয়া পাঠক ভাবিতে পারেন, এত বাধা বাঁধন কেন? এত গুলি ছোটবড় বিধিনিষেধের সৃষ্টি করিয়া ভগবান্‌ বুদ্ধ হয়তো ভিক্ষুদের স্বাধীনতার উপর অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ করিয়া থাকিবেন।

এই বিধিনিষেধগুলির পশ্চাতে বুদ্ধের ধর্ম্মে ও সংঘে স্বাধীনতার যে অপূর্ব্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল তাহাই আমাদের আলোচ্য ও বিবেচ্য। বুদ্ধ যে নির্ব্বাণ বা মুক্তির ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, সেই ধর্ম্মে সিদ্ধিলাভের জন্য তিনি মানুষকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন। অন্য কাহারো মুখাপেক্ষী না হইয়া মানুষ আপনি ভিতর হইতে ধার্ম্মিক হইয়া উঠিবে, সে আপনি আপনার অবলম্বন হইবে ইহাই তাঁহার উপদেশ। দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি মুক্তির পত্রিকা অথবা স্বর্গের চাবি হাতে করিয়া আসিয়া ধর্ম্মার্থীকে শাসাইবেন এমন বিড়ম্বনা বৌদ্ধধর্ম্মে নাই। মানুষকে তিনি যে ধর্ম্মের উদারক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছেন, সেখানে তাহার মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গ বিকাশে কোন বাধাই ঘটিতে পারে না।

বুদ্ধের এই পবিত্র ধর্ম্মের রসধারাসিক্ত উর্ব্বরক্ষেত্রে সংঘের উদ্ভব হইয়াছিল। সংঘ তাঁহারেই সৃষ্টি, তথাপি তিনি কখনো আপনাকে সংঘের নেতা বা চালক বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। অন্তিম জীবনে বৈশালীর বিহারে তিনি উপস্থায়ক আনন্দকে

সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"আনন্দ, সংঘ আমার কাছে কি প্রত্যাশা করিযা থাকেন ? আমি অকপটে সকলের কাছে আমার উপলব্ধ সত্য ব্যাখ্যা করিয়াছি, কোনো কথাই তো গোপন করি নাই। আমি কখনো এ কথা মনে করি না যে, আমি সংঘের চালক অথবা সংঘ আমার অধীন। যদি কেহ এমন মনে করেন, তিনি নেতার আসন গ্রহণ করিয়া সংঘকে দৃঢ়রূপে বাঁধিবার নিয়ম প্রণালী প্রণয়ন করুন। সংঘ বক্ষার জন্য আমি কোনো বাঁধা নিয়ম প্রণালী রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা করি না।"

মহাপুরুষ বুদ্ধের এই উক্তি অতি সুস্পষ্ট। সংঘের স্বাভাবিক বৃদ্ধির পথে অন্তরায় হইয়া তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে কখনো আপনার অধীন করিতে চাহেন নাই। তাঁহার প্রেম ও সাধনায় সংঘ সৃষ্ট হইলেও তিনি অন্ধ স্নেহেব বশবর্ত্তী হইয়া শিশুটিকে একান্তভাবে আপনি কোলে আঁক্ড়াইয়া ধরিলেন না; পরন্তু তাঁহাকে মুক্তির অবারিত প্রান্তরে ছাড়িয়া দিলেন। সেখানে শ্রদ্ধাশীল শ্রাবক ও ভিক্ষুদের স্নেহরস পান করিয়া শিশু আনন্দে বাড়িতেছিল। এইরূপ স্বাধীনভাবে বাড়িতে পাইয়াছিল বলিয়াই এক সময়ে সংঘ ভারতব্যাপী সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিয়াছিল। এই সৃষ্টিব্যাপারে বুদ্ধের কৃতিত্ব ও মহিমা তো আছেই; ভিক্ষুদের ও লোক সাধারণের সহানুভূতি ও সংস্রব সুস্পষ্ট দেখা যাইয়া থাকে।

বৌদ্ধ বিহারে যে সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল সেই সভ্যতা বৌদ্ধসাধুদিগের ও তদানীন্তন জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৃহৎ বনস্পতির ন্যায় সংঘ অতি ক্ষীণ প্রারম্ভ হইতে ধীরে ধীরে মহৎ পরিণামের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সংঘের নিয়মাবলী প্রয়োজনের তাগিদে এইরূপ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্টি নহে, অথবা কোনো স্থানে নির্দ্ধারিত হয় নাই। নিয়মগুলি সমাজের ও সংঘের মধ্যে আলোচিত হইয়া সাধারণ ভাবে গৃহীত হইত। লোকের দাবী,

সুখ-সুবিধা প্রয়োজনাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিয়ম প্রণীত ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

মহাবগ্‌গে "সাদ্ধিবিহারিকের" কর্ত্তব্য বিস্তারিত বর্ণিত আছে। নবীন ভিক্ষু অপর কোনো প্রবীণ ভিক্ষুকে উপাধ্যায় বরণ করিয়া তাঁহারই উপদেশানুসারে জীবন যাপন করিবেন, এইরূপ নিয়ম আছে। উক্ত নবীন ভিক্ষু স্থবিরের সহিত একই বিহারে বাস করেন বলিয়া তাঁহাকে সার্দ্ধবিহারী বা 'সাদ্ধিবিহারিক' বলা হয়। এইরূপ উপাধ্যায়-বরণ-প্রথা প্রথমে ছিল না। দেখা গিয়াছিল, নবীন ভিক্ষুরা জনপদে যাইবার সময়ে যথোচিত বহির্ব্বাস পরিধান করেন না, উচ্ছিষ্ট পাত্রে অন্যের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য গ্রহণ করিয়া আহার করেন, ভোজন সময়ে ভোজনগৃহে—"ভাত চাই, ঝোল চাই" বলিয়া চীৎকার করেন।

তাহাদের এই অশিষ্ট ব্যবহারে জনপদবাসীরা উত্যক্ত হইত। এইরূপ ব্যবহারের কথা পরস্পর বলাবলি করিত এবং লোকে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিত, "এ কেমন ব্যাপার, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণেরা এমন অভদ্র বেশে লোকালয়ে ভিক্ষায় আসিয়া থাকেন? তাঁহারা ভোজন সময়ে ভোজনালয়ে এমন কোলাহল করেন কেমন করিয়া?"

জনপদবাসীদের এই সকল কথা মিতাচার, বিনীত ও বুদ্ধিমান্ ভিক্ষুদের কানে গেল। তাঁহাদের মধ্যেও এই সকল কথার আলোচনা হইল। তাঁহারা এই অভিযোগের কথা ভগবান্ বুদ্ধকে নিবেদন করিলেন। তিনি অর্ব্বাচীন ভিক্ষুদিগকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন—"তোমাদের এমন ব্যবহার করা একান্ত অসঙ্গত, এরূপ করিলে লোকে এই ধর্ম্মে আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহিবে না। পরন্তু যাহারা এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহারাও শ্রদ্ধা হারাইয়া এই ধর্ম্মের আশ্রয় হইতে সরিয়া পড়িবে। এই উপলক্ষে তিনি ভিক্ষুদিগকে একটি ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, নির্ব্বাণের শান্তি, সংযমের দ্বারাই লভ্য, শিষ্টতার দ্বারাই লভ্য এবং বীর্য্যের দ্বারাই লভ্য।

এই দিন স্থির হইল অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ভিক্ষু কোন প্রবীণ ভিক্ষুকে উপাধ্যায় বরণ করিয়া শ্রেয়োলাভের সাধনা করিবেন। শ্রদ্ধায় ও নিষ্ঠায় এক হইয়া নবীন ও প্রবীণ ভিক্ষু পিতাপুত্রের ন্যায় পরস্পরের সহায় হইবেন ও শ্রদ্ধাপ্রীতিতে তাঁহাদের সম্বন্ধ মধুর হইয়া উঠিবে।

এইরূপে যে সার্দ্ধবিহারীর জন্য উপাধ্যায় গ্রহণের বিধি প্রবর্ত্তিত হইল, এই বিধি ভগবান্ বুদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই বিধি কি সঙ্ঘের শান্তশিষ্ট ভিক্ষুরা প্রার্থনা করেন নাই? জন-পদবাসীদের অভিযোগের মধ্যেও কি এমনই একটী অভিলাষ ব্যক্ত ছিল না?

এমন করিয়া বৌদ্ধবিধিগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই শাস্ত্রে বিধি-নিষেধের যে বিস্তৃত তালিকা আছে ভগবান্ বুদ্ধ তাহা প্রভুর ন্যায় সঙ্ঘের মাথায় বোঝার মত চাপাইয়া দেন নাই। বিধিগুলির প্রবর্ত্তনের ইতিহাসের মধ্যে দেশের লোকের ও সংঘের সাধুদের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত আছে।

পঞ্চম অধ্যায়

বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয় ও বিস্তার

ভগবান্ বুদ্ধ কাশীর নিকটবর্ত্তী মৃগদাব নামক স্থানে পঞ্চশিষ্য সমীপে তাঁহার সদ্ধর্ম্ম প্রথমতঃ প্রচার করিয়াছিলেন। অতঃপর কাশীধামে এই ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। এই নগরের যশ নামক এক বণিক তনয় বুদ্ধের মুখে নবধর্ম্মের অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কাশীর প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন। যশের মাতাপিতাও বুদ্ধের শিষ্য হইয়াছিলেন।

এইরূপে নূতন ধর্ম্ম ধীরে ধীরে যখন লোকমধ্যে প্রচারিত হইতেছিল তখনই প্রচারের সুবিধার নিমিত্ত বুদ্ধশিষ্যদের সংঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। ভগবান্ বুদ্ধ শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন—"তোমরা দলবদ্ধ হইয়া সত্যপথে অগ্রসর হইতে থাক, একাকী সত্য-পথে চলিতে চলিতে কেহ কেহ হয়ত দুর্ব্বলতার বশবর্ত্তী হইয়া বিপথগামী হইতে পারে। তোমরা পুণ্যে প্রেমে ও সত্যানুরাগে এক হইয়া বহুজনের হিত কামনায়, এই আদিকল্যাণ, অন্তকল্যাণ, মধ্য- কল্যাণ সদ্ধর্ম্মের কাহিনী প্রচার কর। পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হউক। তোমরা লোকের কাছে ঘোষণা কর, তাহাদের জীবন পবিত্র। এই ধর্ম্মবাণী নিঃসন্দেহ তাহাদের চিত্তস্পর্শ করিবে।"

এই সময়ে উরুবিল্বে কাশ্যপ নামক এক প্রসিদ্ধ অগ্নিউপাসক ছিলেন। তিনি ও তাঁহার দুইভ্রাতা তাহাদের সহস্র শিষ্যসহ বুদ্ধের শিষ্য হওয়ায় নবধর্ম্মের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে বিম্বিসার মগধের রাজা ছিলেন। বুদ্ধ শিষ্যগণসহ মগধের রাজধানী রাজগৃহে ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করেন। মগধরাজ নবধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার বেণুবন নামক প্রমোদ উদ্যান বুদ্ধকে দান করিয়াছিলেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ সারিপুত্র ও

বুদ্ধ উপদেষ্টা

মৌদ্‌গল্যায়ন বুদ্ধের শিষ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে মগধ রাজ্যে নূতন ধর্ম্ম ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বিম্বিসার অঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, সুতরাং অঙ্গদেশ তখন মগধরাজ্যভুক্ত ছিল।

নবধর্ম্ম প্রচার যাত্রায় বাহির হইয়া ভগবান্ বুদ্ধ কপিলবাস্তু নগরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা তখন জীবিত ছিলেন। এই নগরের বহুলোক নবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতৃব্যপুত্র আনন্দ নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার উপস্থায়ক হইলেন। আনন্দ মনোপ্রাণে ভগবান্ বুদ্ধের সেবা করিতেন, তিনি তাঁহার দক্ষিণ বাহুবৎ সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। আনন্দ তাঁহার আজ্ঞাপালনের নিমিত্ত সর্ব্বদা এমনভাবে সতর্ক থাকিতেন যে, তাঁহাকে কদাচ দ্বিতীয় আহ্বান করিবার প্রয়োজন হইত না।

আনন্দের অনুরোধে বুদ্ধ নারীদিগকে সন্ন্যাস-দানে সম্মত হইয়াছিলেন। বিমাতা মহাপ্রজাবতী গৌতমী সর্ব্বপ্রথমে ভিক্ষুণী হইলেন। বুদ্ধের পত্নী যশোধরাও বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা পাইয়াছিলেন। পুত্র রাহুলও নবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের পরে ভগবান্ বুদ্ধ প্রায় ৪৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি বৈশালী ও উহার নিকটবর্ত্তীস্থানে ধর্ম্ম প্রচার করেন। এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল। পাবার চুন্দ নামক এক অনুরাগী শিষ্যের আম্রকাননে বাস করিয়া তিনি কিছু দিন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। চুন্দ একদিন তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। উহার পরে তাঁহার রক্তামাশয় রোগ জন্মে। অসুস্থ দেহেই তিনি কুশী নগরে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে একস্থলে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়েন। আনন্দ তাঁহাকে সুশীতল নির্ম্মল জল পান করাইয়া সুস্থ করেন। অতঃপর তিনি শিষ্যগণসহ হিরণ্যবতী নদীর তীরবর্ত্তী কুশী নগরের উপকণ্ঠে মল্লদের শালবনে গমন করেন। এই উদ্যানেই তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি আনন্দকে বলিয়াছিলেন,—"হে আনন্দ, আমার মৃত্যুর পরে আমার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মই তোমাদের চালক হইবে।"

বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে মহাপুরুষ বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। তাঁহার অস্থি প্রভৃতি দেহ-ধাতু গ্রহণের জন্য আট রাজ্য হইতে প্রতিনিধিগণ কুশীনগরে আগমন করিয়াছিলেন। দেহধাতুর বিভাগ

লইয়া ইহাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। দ্রোণ নামক এক ব্রাহ্মণ অস্থি ভাগ করিয়াছিলেন। তিনি সকলের অনুমতিক্রমে যে পাত্রে অস্থি রক্ষিত হইয়াছিল তাহা গ্রহণ করেন। অস্থিবিভাগ শেষ হইবার পরে মৌর্য্যগণ কুশী নগরে আগমন করেন. তাঁহারা দেহধাতু না পাইয়া চিতার অঙ্গার লইয়া যান। এই সকলের দ্বারা উত্তরকালে আটটি শরীরস্তূপ, একটি কুম্ভস্তূপ এবং একটি অঙ্গারস্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে ভারতবর্ষে অঙ্গ, মগধ. কাশী, কোশল. ভজ্জি, মল্ল, চেদি, বংশ, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, সুরসেন, অশ্বক. অবন্তী. গান্ধার, কাম্বোজ এই ষোলটি বৃহৎ রাজ্য ছিল। বুদ্ধের জীবদ্দশায়ই এই সকলের অধিকাংশ রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছিল। বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠে ইহা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ভগবান্ বুদ্ধ স্বয়ং, তাঁহার ধর্ম্ম অঙ্গ, মগধ. কাশী. কোশল. ভজ্জি ও মল্ল দেশে প্রচার করিয়াছিলেন !

বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণলাভের পরে একবিংশতি দিবসে তাঁহার দেহধাতু বিভক্ত হয়। ঐ দিবস মহাকাশ্যপ ভিক্ষু সংঘে প্রস্তাব করেন— "পঞ্চশত ভিক্ষু রাজগৃহে বর্ষাবাস গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্ম ও বিনয় সমবেতভাবে আবৃত্তি করুন।" এই প্রস্তাব যথারীতি প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত হইল।*

বেরভার পর্ব্বতের পার্শ্বে সপ্তপর্ণী গুহাদ্বারে মগধরাজ অজাতশত্রু এক পরম রমণীয় সভামণ্ডপ নিম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মণ্ডপের ভিত্তিস্তম্ভ ও সোপান সুবিভক্ত করা হইয়াছিল। নানা প্রকার লতা ও মাল্যদ্বারা মণ্ডপ সুচিত্রিত করা হইয়াছিল।

শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে এই মহাসঙ্গীতির অধিবেশন আরম্ভ হয়। আনন্দপ্রমুখ পাঁচশত ভিক্ষু উপবিষ্ট হইলে সঙ্ঘস্থবির মহাকাশ্যপ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

---

* প্রথম বৌদ্ধমহাসঙ্গীতির বিবরণটী সুহৃদ্‌বর শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের এক রচনা হইতে সঙ্কলিত হইল।

"বন্ধুগণ ধর্ম্ম ও বিনয় ইহার মধ্যে কোন্‌টী আমরা প্রথমে আবৃত্তি করিব ?"

ভিক্ষুগণ উত্তর করিলেন—"মাননীয় মহাকাশ্যপ, বিনয় বুদ্ধশাসনের আয়ু, বিনয় থাকিলে বুদ্ধশাসন থাকিবে, অতএব প্রথমে আমরা বিনয়েরই আবৃত্তি করি।"

সঙ্ঘস্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে অগ্রবর্ত্তী হইবেন ?"

আয়ুষ্মান্ উপালি।

কেন আনন্দ কি সমর্থ নহেন্ ? তিনি যে সমর্থ নহেন তাহা নহে, কিন্তু ভগবান্ জীবিত অবস্থাতেই বলিয়া গিয়াছেন যে বিনয়ধর (বিনয়জ্ঞ) সমূহের মধ্যে স্থবির উপালিই শ্রেষ্ঠ। অতএব তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা বিনয় আবৃত্তি করিব।

অনন্তর মহাকাশ্যপ উপালিকে প্রশ্ন করিলেন—"বন্ধু উপালি, ভগবান্ প্রথম পারাজিক (বিনয় পিটকের অন্তর্গত প্রাতিমোক্ষের প্রথম নিয়ম) কোথায় বিধান করিয়াছিলেন ?"

তিনি বলিলেন—বৈশালীতে।

মহাকাশ্যপ বলিলেন—কাহাকে লক্ষ্য করিয়া ?

তিনি উত্তর করিলেন—কলন্দকপুত্র সুদত্তকে। এইরূপে মহাকাশ্যপ এক একটি নিয়ম সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে তাহা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন আর উপালি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। এই প্রণালীতে ক্রমশঃ সমগ্র মহাবিভঙ্গ, ভিক্খুনীবিভঙ্গ, খন্ধক (মহাবগ্‌গ ও চুল্লবগ্‌গ) ও পরিবার উল্লেখ করিয়া তাহার নাম 'বিনয় পিটক' করা হইল।

অনন্তর মহাকাশ্যপ ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাহাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ধর্ম্ম আবৃত্তি করিতে পারা যায় ?" ভিক্ষুগণ স্থবির আনন্দের নাম করিলেন।

মহাস্থবির মহাকাশ্যপ প্রশ্ন করিলেন—"ভগবান্ ব্রহ্মজালসূত্ত কোথায় কাহাকে কি জন্য কি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ?" আনন্দ তাহার যথাযথ উত্তর দিলেন। এইরূপে অন্যান্য সূত্র সম্বন্ধেও প্রশ্নোত্তর

হইল এবং নিকায়সমূহ (দীঘ, মজ্‌ঝিম, সংযুক্ত, অঙ্গুত্তর ও খুদ্দক) সংগৃহীত হইল। ইহারই নাম 'সূত্র পিটক'।

তারপরে পূর্ব্ব প্রকারেই স্থবির অনুরুদ্ধকে ধর্ম্মাসনে স্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসঙ্গণি, বিভঙ্গ, কথাবথ্থু, পুগ্‌গল, পঞ্‌ঞত্তি যমক ও পট্‌ঠান আবৃত্তি করিয়া অভিধর্ম্ম পিটক সংগ্রহ করিলেন।

মহাপুরুষ বুদ্ধের পরিনিব্বাণ লাভের পরে তাঁহার প্রচারিত বিনয় ও সূত্রই বৌদ্ধগণের শাস্তা হইল। এই ধর্ম্ম ধীরে ধীরে প্রচারিত হইতে লাগিল। ইহার শতবর্ষ পরে বৈশালীর ভিক্ষুগণ দশটি নূতন অধিকার পাইবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। ভিক্ষুরা স্বর্ণ ও রৌপ্য দান গ্রহণ করিতে পারিবেন, ইহা ঐ দশাধিকারের অন্যতম। এই বিষয় লইয়া বৈশালীর ভিক্ষুরা একমত হইতে পারেন নাই। ভিক্ষু কাকন্দকের পুত্র যশ ইহার প্রতিবাদ করিলেন। এই বিষয়ের মীমাংসার নিমিত্ত তিনি বৈশালীতে এক মহাসমিতির আহ্বান করেন। তিনি পশ্চিম ভারত, অবন্তী এবং দক্ষিণ ভারতের ভিক্ষুগণ সমীপে দূত পাঠাইয়া জানাইলেন—"মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনারা এই বিষয়ের আইনতঃ মীমাংসা করিবার জন্য এখানে আগমন করুন। নচেৎ যাহা ধর্ম্ম নহে তাহাই প্রচারিত হইবে, ধর্ম্মই অবজ্ঞাত হইবে। যাহা বিনয় নহে তাহাই প্রচারিত হইবে, বিনয় অবজ্ঞাত হইবে।"

বৈশালীর ভিক্ষুগণ যশের এই আন্দোলন জানিতে পারিয়া তাঁহারাও পূর্ব্বদেশীয় সমস্ত ভিক্ষুকে স্বদলে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বৌদ্ধদের মধ্যে দুইটি দল স্থাপিত হইল।

বৈশালী নগরে যখন ভিক্ষুমণ্ডলী মহাসভায় সমবেত হইলেন তখন প্রসিদ্ধ স্থবির রেবত তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, —"মাননীয় সঙ্ঘ আমার কথা শ্রবণ করুন,—কয়টি নিয়মের বৈধতা সঙ্ঘের আলোচ্য, এযাবৎ যত বক্তৃতা শুনিলাম তাহাতে বক্তারা আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই, কেবল অবান্তর বাক্যই

বলিয়াছেন. কতিপয় মধ্যস্থের উপর বিচার ভার অর্পণ করিয়া সঙ্ঘ এই বিষয়ের মীমাংসা করুন।”

উভয় পক্ষের চারিজন করিয়া আটজন মধ্যস্থের উপর বিচারকার্য্য অর্পিত হইল। মধ্যস্থগণ সকলে একমত হইয়া বৈশালীর ভিক্ষু-গণকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩৭৭ অব্দে বৈশালীতে এই মহাসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় সাত শত প্রসিদ্ধ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। বৈশালীর ভিক্ষুদের দাবী অসঙ্গত প্রতিপন্ন হইল, কিন্তু উভয়পক্ষ মধ্যস্থদের মীমাংসা গ্রহণ করিলেন না। এই সময় হইতে নেপাল, তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণ 'মহাসাঙ্ঘিক' এবং সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যাম প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণ 'থেরবাদী' আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। পরে মহা-সাঙ্ঘিকেরা “মহাযান”এবং থেরবাদীরা 'হীনযান' নামে পরিচিত হন।

বৌদ্ধধর্ম্মে জাতিভেদ ছিল না. এই ধর্ম্ম ব্রাহ্মণকে উচ্চবর্ণের নিমিত্ত বংশ গৌরব দান করিত না। এইজন্য মগধের অনার্য্যগণই প্রথমতঃ দলে দলে দলে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। যে সকল দেশের অধিবাসীদের অধিকাংশই আর্য্য সেই সকল দেশে প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্ম তেমন অনায়াসে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই।

কোন ধর্ম্ম যতই উচ্চ হউক না কেন, কতগুলি অনুকূল বাহ্য কারণ না ঘটিলে ঐ ধর্ম্ম লোকমধ্যে ব্যাপ্তি লাভ করিতে পারে না। বুদ্ধের জীবিত কালে মগধরাজ বিম্বিসার ও অজাতশত্রু নূতন ধর্ম্মে অনুরাগী হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা তেমন শক্তিমান্ ছিলেন না, আপনাদের নাতিবৃহৎ রাজ্যের বাহিরে তাঁহাদের কোনো প্রভুত্ব ছিল না। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মগধ রাজ্য যখন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হইল তখন রাজশক্তির পৃষ্ঠ-পোষণে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল।

মহারাজ অশোকের পিতামহ মগধরাজ্য চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদের অধীনতাপাশ হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করিয়া কীর্ত্তিমান হইয়া-ছিলেন। নর্ম্মদা নদী হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয় ও হিন্দুকুশ

পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত তাঁহার শাসনাধীন হইয়াছিল। গ্রীকবীর সেলুকস্ তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে গ্রীক শাসনাধীন পঞ্জাব ও কাবুল প্রদান করেন। বিজয়ী ভারতীয় বীরের সহিত তিনি স্বীয় দুহিতাকে বিবাহ দিয়া তাঁহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীনকালে হিন্দু ও গ্রীক উভয় জাতিই সুসভ্য ছিলেন, সুতরাং এই দুই জাতির মিত্রতা উভয় জাতির পক্ষেই কল্যাণকর হইয়াছিল। গ্রীকেরা ভারতীয়দের নানাবিদ্যা এবং হিন্দুরা গ্রীকদের জ্যোতিষ ও গণিত প্রভৃতি শিক্ষা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস্ চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে বাস করিতেন। তাঁহার ভারত-বিবরণে সেই সময়ের বহু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ তখন ১১৮টি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদিগকে পরাস্ত করিয়া ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূপতি হইয়াছিলেন।

অশোকের এই পরাক্রমশালী পিতামহ কিংবা তাঁহার পিতা বিন্দুসার বৌদ্ধ ছিলেন না। অশোক যখন এই সুবিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তখন এই ধর্ম্ম নিখিল ভারতে এবং ভারতের বাহিরে কোনো কোনো রাজ্যে প্রচারিত হইবার সুবর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্দ্ধনের জন্য বৌদ্ধ যাজকগণ সম্রাট্ অশোকের সম্বন্ধে যে সকল গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন সেই সকল পাঠ করিলে মনে হয়, বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি নৃশংস ও পাপাচারী ছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি পুণ্যময় জীবন লাভ করেন। বৌদ্ধধর্ম্ম মহামতি অশোককে নবজীবন দান করিয়াছিল ইহা সত্য, কিন্তু তিনি উক্ত ধর্ম্মগ্রহণের পূর্ব্বে নিষ্ঠুর ও অধার্ম্মিক ছিলেন তাহা মনে করিবার পক্ষে কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যায় না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার-ইতিহাসের শিরোভাগে মহামতি অশোকের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। ভগবান্ বুদ্ধের মৈত্রীমূলক ধর্ম্ম

যাঁহাদের প্রচেষ্টায় পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে অশোক তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ;

অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণের ইতিহাস তাঁহারই অনুশাসন-লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়। তিনি তাঁহার রাজত্বের অষ্টবর্ষে কলিঙ্গ জয় করেন। ঐ যুদ্ধে বহু ব্যক্তির জীবননাশ এবং বহু ব্যক্তি বন্দী হইয়াছিল। হিংসামূলক এই যুদ্ধ তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছিল। তাঁহার শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে—"এই রাজ্যের ব্রাহ্মণ ও সাধুরা মাতাপিতা ও গুরুজনকে ভক্তি করে, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও দাসদাসীর প্রতি ইহারা সদ্ব্যবহার করে। এইরূপ চরিত্রবান্ ব্যক্তিগণ যে দেশে বাস করে সেই দেশে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে।" যাহারা নিরপরাধ, শিষ্ট ও সচ্চরিত্র তাহাদিগকে হত্যা ও বন্দী করিয়া অশোক স্বভাবতঃই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি অহিংসমূলক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার আড়াই বৎসর পরে তিনি ধর্ম্মযাজকরূপে বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে নিরত হইলেন।

দীপবংস ও মহাবংসে উক্ত হইয়াছে যে, মহারাজ অশোক কাশ্মীর, গান্ধার, মহিসা (বর্ত্তমান মহীশূর), বনবাস (সম্ভবতঃ রাজপুতনা), অপরন্তুক (পশ্চিম পঞ্জাব), মহারাষ্ট্র, যোনলোক (বাক্ট্রিয়া ও গ্রীকরাজ্য সমূহ), হিমবত (মধ্য হিমালয়), সুবর্ণ-ভূমি (থাটন অর্থাৎ নিম্ন ব্রহ্মদেশ), এবং লঙ্কাদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার অনুশাসন লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, চোলা (মান্দ্রাজ), পাণ্ড্য (মাদুরা), সত্যপুরা (সাতপুরা পর্ব্বতশ্রেণী), কেরল (ত্রিবাঙ্কুর), সিংহল, সিরিয়ার গ্রীকরাজ এণ্টিয়োকাসের রাজ্যে তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে বৌদ্ধধর্ম্ম গৃহীত হইয়াছিল। অপর এক অনুশাসন লিপিতে প্রকাশ যে, তাঁহার দূতগণ সিরিয়া, মিশর, এপিরস্, মেসিডন্ এবং সিরিনের গ্রীকরাজাদের সমীপে গমন করিয়াছিল।

সম্রাট্ অশোক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথিবীময়

পরিব্যাপ্ত করিবার জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র ও দুহিতা সঙ্ঘমিত্রাকে সিংহলে পাঠাইয়াছিলেন। সিংহলরাজ তিস্‌স এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিংহলরাজকুমারী অনুলা সঙ্ঘমিত্রার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন।

রাজর্ষি অশোক এমন ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন যে, ধর্ম্ম তাঁহার নিকট পুত্র, কলত্র ও বিত্ত হইতেও প্রিয়তর ছিল। দেশের সর্ব্বত্র লোকের মনে বৌদ্ধধর্ম্মের মহত্ত্ব ও সুনীতি মুদ্রিত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে তিনি কত স্তূপ, কত মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন তাহার যথার্থ সংখ্যা এখনও নির্ণীত হয় নাই। গিরিগাত্রে এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ শিলাস্তম্ভে বৌদ্ধধর্ম্মের সুনীতি ও সদুপদেশ উৎকীর্ণ করাইয়া লোক-কল্যাণ সাধনে তিনি যেমন আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা দেখাইয়াছেন এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর দেখা যায় না।

তাঁহার শিলালিপি ও স্তম্ভলিপি দ্বারা তিনি লোকসাধারণকে এই অনুরোধ জানাইয়াছেন—(১) কেহ প্রাণী হত্যা করিও না (২) প্রধান প্রধান নগরে আড়ম্বরপূর্ণ ভোজ প্রদান করিও না (৩) মাতা-পিতার বশ্যতা স্বীকার কল্যাণপ্রদ (৪) বন্ধু ও স্বজনবর্গ, আত্মীয়-কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুদের প্রতি বদান্য হওয়া বিধেয়। (৫) মিতব্যয়ী ও বিবাদে নিবৃত্ত হওয়া অতি উত্তম। (৬) আত্মসংযম, চিত্তশুদ্ধি, কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততা এই কয়টিগুণ অতি উৎকৃষ্ট, দরিদ্রেরাও এই সকলগুণ প্রদর্শন করিতে পারে। (৭) লোকে আরোগ্যলাভ, বিবাহ, সন্তানলাভ, প্রভৃতি উপলক্ষ্যে আপন সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশের জন্য উৎসব করিয়া থাকে। এই সকল উৎসব বিকৃত ও অকিঞ্চিৎকর। ধর্ম্ম-বিষয়ক উৎসবই বস্তুতঃ সৌভাগ্যজ্ঞাপক। ধর্ম্মোৎসবের মূলকথা দাস-দাসী ও ভৃত্যবর্গের প্রতি যথাবিহিত ব্যবহার, গুরুজনের প্রতি সসম্মান ব্যবহার প্রাণীদের প্রতি অহিংসা, ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুদের প্রতি বদান্যতা। চির-কল্যাণ যাহার কাম্য তাহাকে এইরূপ উৎসবই করিতে হইবে। (৮) তোমার সহিত যাহার ধর্ম্মমত এক নহে এমন গৃহী অথবা

সন্ন্যাসী যে-কোনো ব্যক্তির ধর্ম্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিও। আপনার ধর্ম্মমতকে শ্রেষ্ঠত্বদান করিবার জন্য অন্যের ধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ অসঙ্গত। বাক্যে সংযত হওয়া বিধেয়। (৯) ধর্ম্ম কল্যাণপ্রদ, কিন্তু ধর্ম্ম কাহাকে বলে? লালসার নিবৃত্তি, অপরের কল্যাণ-সাধন, করুণা, বদান্যতা, সত্যানুরাগ এবং পবিত্রতাই ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইতে পারে। লোকে স্বকৃত উৎকৃষ্ট কার্য্যের গর্ব্ব করিয়া থাকে কিন্তু স্বকৃত দুষ্কার্য্যের প্রতি অন্ধ। আত্ম-কল্যাণ-সাধনের জন্য আত্মপরীক্ষা প্রয়োজনীয়।

রাজনৈতিক কার্য্য পরিচালনার জন্য মৌর্য্যভূপতিদের শাসনকালে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের অধীনে 'রাজুক', প্রাদেশিক', মহাপাত্র', 'যুক্ত', 'উপযুক্ত', 'লেখক', 'উপাধিধারী', এই সকল রাজ কর্ম্মচারী ছিলেন। মৌর্য্যভূপতিদের রাজ্য সুশাসিত, সুগঠিত ছিল এবং মৌর্য্য রাজাদের শাসনকালের বিবরণ যথাবিধি লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা ছিল। মহামতি অশোক তাঁহার রাজত্বের চতুর্দ্দশ বর্ষ হইতে "ধর্ম্ম-মহাপাত্র", 'ধর্ম্মযুক্ত', উপাধিধারী একদল কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের জনমণ্ডলী ধর্ম্মবিধি প্রতিপালন করে কিনা ধর্ম্ম-বিভাগীয় ঐ সকল কর্ম্মচারী তাহাই পরিদর্শন করিতেন। দক্ষিণ ভারতের চোলা, পাণ্ড্য প্রভৃতি কয়টি ক্ষুদ্র রাজ্য ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষ এমনকি আফ্‌গানিস্থান, বেলুচিস্থান, দক্ষিণ হিন্দুকুশ প্রভৃতি রাজ্য সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তিনি তাঁহার এই সুবিস্তৃত রাজ্যের সর্ব্বত্র যেরূপ অসংখ্য স্তূপ, স্তম্ভ ও বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে ইহা সুনিশ্চিত যে, অশোকের ধর্ম্মরাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিত। অশোক-প্রেরিত-ধর্ম্মপ্রচারকগণ এশিয়া ইয়ুরোপ এবং আফ্রিকা এই তিন মহাদেশে গমন করিয়াছিলেন। অশোকের ধর্ম্মপ্রচারের ইতিবৃত্ত পরম বিস্ময়কর। বৌদ্ধধর্ম্মের মহোচ্চ আদর্শের প্রতি প্রবিচলিত অনুরাগ হেতু তাঁহার অন্তরে ধর্ম্মপ্রচারের আকাঙ্ক্ষারূপ যে বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল তাহা ধারণার অতীত।

সম্রাট্ অশোক রুগ্ন নরনারীর ও জীবজন্তুর জন্য দাতব্য-চিকিৎ-

সালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া অসামান্য জীবপ্রীতির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে জীবসেবার এই আদর্শ তিনিই সর্ব্ব প্রথমে প্রদর্শন করেন। অশোকের মত প্রসিদ্ধ ভূপতি পৃথিবীর ইতিবৃত্তেই বিরল। তাঁহার পুণ্যময় নাম অদ্যাপি যত লোকের মুখে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, সারল্‌মেন বা সিজারকেও তত অধিক লোকে স্মরণ করে না। ইয়ুরোপের বল্গা নদী হইতে এশিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত জাপান এবং সাইবিরিয়া হইতে সিংহল পর্য্যন্ত দেশে দেশে সংখ্যাতীত নরনারী ধর্ম্মপ্রাণ অশোকের নাম এখনও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্মরণ করিয়া থাকে। অশোকাবদান, দীপবংস, মহাবংস এবং প্রসিদ্ধ বৌদ্ধশাস্ত্রীয় ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষপ্রণীত বিনয়-ভাষ্যে সম্রাট্ অশোকের গৌরবময় জীবনের কীর্ত্তি-কাহিনী বিবৃত রহিয়াছে।

সম্রাট্ অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনার নিমিত্ত এক সহস্র বৌদ্ধভিক্ষু পাটলীপুত্র নগরে এক মহাসভায় মিলিত হইয়াছিলেন। মাননীয় ভিক্ষু তিস্‌স এই সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি বিস্তৃতভাবে বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশে ধর্ম্মশাস্ত্রবিষয়ক বহু সংশয় ছিন্ন হইয়াছিল। ঐ সভায় তিস্‌স যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা কথাবত্থু নামে খ্যাত। উহা অভিধর্ম্মের সপ্তম খণ্ডরূপে গণ্য হইয়া থাকে।

বুদ্ধঘোষকে বৌদ্ধশাস্ত্রের শঙ্করাচার্য্য বলা যাইতে পারে। তাঁহার নিবাস মগধে। তিনি সিংহলে গমন করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রীয় ভাষ্য রচনা করিয়া অমরকীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি খৃষ্টীয় ৪৫০ অব্দে সিংহল হইতে ব্রহ্মদেশে গমন করিয়া তথায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন। ৬৩৮ অব্দে শ্যামরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়। এখান হইতে সুমাত্রায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। এই সমস্ত রাজ্যে হীনযান বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত আছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে উত্তরপশ্চিম ভারতে মহাযান বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে কাশ্মীর

রাজ পুষ্যমিত্র বৌদ্ধদিগকে নির্য্যাতন করিয়া কু-কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন।

তাঁহার পুত্র অগ্নিমিত্রের সহিত গ্রীকদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল। গ্রীক সেনাপতি রাজা মিণ্ডার এই যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছিলেন। ইনি মহাস্থবির নাগসেনের সহিত বৌদ্ধধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছিলেন উহা "মিলিন্দপঞ্‌হো" নামক সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। মহাযান বৌদ্ধদের এই ধর্ম্মগ্রন্থ হীনযান সম্প্রদায়ে বৌদ্ধগণও পরম শ্রদ্ধাসহকারে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষণ বংশীয় নরপতি কণিষ্ক কাশ্মীর জয় করেন। বিন্ধ্যগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র উত্তর ভারত, কাশ্মীর, ইয়রখণ্ড, খাস্‌গর, খোকন প্রভৃতি রাজ্য এই প্রবল প্রতাপান্বিত ভূপতির করতলগত হইয়াছিল। সম্রাট্ অশোকের মৃত্যুর পরে মৌর্য্যবংশের গৌরবরবি অস্তমিত হইয়াছিল। তাঁহার পরে কণিষ্কের তুল্য শক্তিশালী রাজা ভারতবর্ষে আর রাজত্ব করে নাই। সম্রাট্ কণিষ্কও বৌদ্ধধর্ম্মে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। স্তূপ ও বিহার নির্ম্মাণ এবং প্রচারক প্রেরণ করিয়া তিনি এই ধর্ম্মের বহুল প্রচারে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। কণিষ্কের রাজত্বকালে চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

পার্শ্ব নামক এক স্থবিরের নিকট কণিষ্ক অবসর সময়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। নানাদলের নানাপ্রকার শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া অনেক সময়ে সম্রাট্ হতবুদ্ধি হইতেন। সম্রাট স্থবিরকে জানাইলেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হওয়া উচিত। সম্রাটের এই অভিপ্রায় অনুসারে বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনার নিমিত্ত এক মহাসভা আহূত হয়। স্থবির বসুমিত্র এই সভার সভাপতি এবং বুদ্ধচরিত-প্রণেতা অশ্বঘোষ সহকারী সভাপতি বৃত হইয়াছিলেন। অনেকদিন এই মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথমতঃ কাশ্মীরের কুন্দল বনবিহার, পরে জালন্ধরের কুবল সঙ্ঘারামে মহা-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় মূল বৌদ্ধশাস্ত্র অবলম্বনে উপদেশ,

বিভাস, অভিধর্ম্মবিভাস নামক তিনখানি ভাষ্যগ্রন্থ সংস্কৃতে সঙ্কলিত হয়। এই গ্রন্থত্রয়ই মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধদের শাস্ত্রগ্রন্থ হইয়া গিয়াছে।

এই সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের উভয় শাখার মধ্যে ব্যবধান বর্দ্ধিত হইল। উভয়ের ধর্ম্মশাস্ত্র মূলতঃ এক হইলেও বস্তুত পৃথক হইল। উভয় সম্প্রদায়ের বুদ্ধও নামে এক হইলেও যথার্থতঃ এক নহেন। হীনযানীয় বুদ্ধ মহাপুরুষ, নরসিংহ কিন্তু মহাযানীর বুদ্ধ দেবতা, শ্রদ্ধাশীল ভক্তদের হৃদয় হইতে তাঁহার উদ্ভব হইয়াছে। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের আদিম মূর্ত্তি রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়া ক্ষোভের কোনো কারণ নাই। বীজ হইতে বনস্পতির উদ্ভব, বনস্পতির সহিত বীজের আকৃতিগত সাদৃশ্য না থাকিলেও উহা বীজেরই সার্থক পরিণতি।

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে চীনের এক সম্রাট্ বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তখন হইতেই চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া থাকিবে। খৃষ্টের প্রথম শতকে কুশান নরপতি কণিষ্কের শাসনকালে ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ চীনে এই ধর্ম্ম প্রচার করেন। সেই সময়ে চীনে হ্যানবংশীয় সম্রাট্ মিংতি রাজত্ব করিতেছিলেন। পিকিঙ্ নগর হইতে পাঁচশত মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে তাঁহার রাজধানী অবস্থিত ছিল। তাঁহার রাজধানী হেনান নগরেই সর্ব্বপ্রথমে বৌদ্ধকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। হেনান নগর হেনানপ্রদেশের রাজধানী। এখন এই প্রদেশের লোক সংখ্যা প্রায় ২ কোটি।

সম্রাট্ মিংতি পেশোয়ারে সম্রাট্ কনিষ্কের রাজসভায় সাই-ইন (Tsai yin) নামক এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। মাতঙ্গ ও ধর্ম্মরক্ষ নামক দুই জন বৌদ্ধসাধু ইহার সহিত চীন দেশে গমন করেন। ইহাদের সঙ্গে বহুসংখ্যক বৌদ্ধগ্রন্থ প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ শ্বেত অশ্বের পৃষ্ঠে ঐ গ্রন্থরাজি বাহিত হইয়াছিল। ঐ শ্বেত অশ্বের মৃত্যু হইলে হেনান নগরে যে স্থানে উহাকে সমাধিস্থ করা হয় সেই স্থানে এক প্যাগোডা (মন্দির) নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার নাম

পাই-মা-জু বা শ্বেতাশ্ব মন্দির।

এই সময় হইতে চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইতে থাকে। তখন হইতে খৃষ্টের ত্রয়োদশ শতক পর্য্যন্ত হেনানে সকল সময়ে ভারতীয় ধর্ম্ম, সাহিত্য, দর্শন ও শিল্প আদৃত হইতেছিল।

খ্রীষ্টের তৃতীয় শতকে উ-তি চীন সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে বোধি-ধর্ম্ম নামক এক ভারতীয় ভিক্ষু হেনানে গমন করিয়া ধ্যান-তত্ত্ব প্রচার করেন। হেনানের নিকটবর্ত্তী সুংশান পাহাড়ে অনেকগুলি বৌদ্ধমন্দির আছে। তথাকার শাওলিংজু নামক মন্দিরে ভিক্ষু বোধিধর্ম্ম নয় বৎসরকাল ধ্যানে মগ্ন ছিলেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী সম্রাট্ তাই-সুঙ্ রাজত্ব করিতেন। তিনি হেনান নগরে এক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় নানাশাস্ত্র বিশেষভাবে আলোচিত হইত। ঐ বিশ্ববিদ্যলয়ের অধ্যাপকগণ ভারতের ধর্ম্ম ও ভারতের সভ্যতা সমগ্র চীনে এবং কোরিয়া ও জাপানে প্রচারিত করেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনের সহিত ভারতের আদান-প্রদানের যোগ বিশেষভাবে ছিল। সম্রাট্ তাইসুঙের শাসন-কালে চীনাভিক্ষু উয়ান-চুয়াঙ্ ভারত-ভ্রমণে আগমন করেন। তিনি বহুবৎসর ভারতবর্ষে ছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ভারত-ইতিহাসের মূল্যবান্ তথ্যে পূর্ণ। উয়ান-চুয়াঙ্ হেনানে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পরে ই-চিঙ্ ভারত-ভ্রমণে বাহির হন। বুদ্ধের জন্মভূমি ভারত-বর্ষকে তখন বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী চীনারা স্বর্গভূমি বলিয়া মনে করিতেন। ই-চিঙ্ এই স্বর্গে ২৫ বৎসর বাস করিয়া স্বদেশে গমন করেন। এই সময় হইতে প্রায় ছয়শত বৎসর কাল চীনা নরনারীর সমগ্র জীবনে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতা অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

জাপানের ঠিক কোন্ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয় তাহা অসংশয়ে বলা যায় না। মোটামুটি ইহা বলা যায় যে, খৃষ্টের ষষ্ঠ শতকে জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। ঐ সময় হইতে

আজ পর্য্যন্ত জাপানে সংস্কৃত নানাশাস্ত্র আলোচিত হইতেছে। জাপানে এখনও বৌদ্ধদের পরিচালিত সাতটি কলেজে সংস্কৃত সাহিত্য-বিজ্ঞানের অধ্যাপনা হইয়া থাকে। খৃষ্টের সপ্তম শতকে বিখ্যাত চীনা ভারত-ভ্রমণকারী উয়ান-চুয়াঙ্‌ ও তাঁহার কতিপয় পণ্ডিতশিষ্য চীনের "বৌদ্ধ অনুবাদ-প্রতিষ্ঠানে" অধ্যাপকতা করিতেন। কয়েকজন জাপানী পুরোহিত ইহাদের নিকট সংস্কৃত শাস্ত্রাভ্যাস করিতেন। ৭৩৫ অব্দে বোধিসেন অপর এক ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষুসহ জাপানে গমন করেন। এই সময় হইতে জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম ও সংস্কৃত শাস্ত্র বিশেষভাবে আলোচিত হইতেছিল

চীন হইতে জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। সেখানে কালক্রমে ঐ ধর্ম্ম বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। জাপানের বৌদ্ধ সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে "দাই-নিচি" সম্প্রদায় বিশেষ বিখ্যাত। জাপানের পুরাণে সূর্যদেবতার নাম 'দাই-নিচি। 'দাই' অর্থ মহৎ আর 'নিচি' অর্থ সূর্য। প্রথমে এই সম্প্রদায়ের উপাস্য বুদ্ধের নাম ছিল "শ্রীমহাবৈরোচন তথাগত।" অতঃপর এই নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "বিরুশানো নিয়োরাই" হয়। নিয়োরাই অর্থ উপশম। জাপানীরা তথাগতের বদলে ইহা ব্যবহার করিতে লাগিল। পরে এই আধা সংস্কৃত আধা জাপানী নাম পুরাপুরি জাপানী হইয়া —"দাইনিচি নিয়োরাই" নাম পরিগ্রহ করিল।

কেহ কেহ মনে করেন দাইনিচি নিয়োরাই স্বয়ং শাক্যমুনি। আবার কেহ মনে করেন দাইনিচি নিয়োরাই আসল বুদ্ধ—বুদ্ধের নিয়ম মূর্ত্তি। তিনি সমস্ত ভূতের হেতু ও কর্ত্তা এবং শাক্যমুনি তাঁহার অবতার—গুণময় ব্যক্তি মাত্র।

জাপানী তাইজো-কাই বুদ্ধের পদ্মাসনের পাপড়িতে "অ" এবং কঙেকাকাই বুদ্ধের পদ্মের পাপড়িতে "বং" লেখা থাকে। এই দুইটি অক্ষরের রূপ অবিকল সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অক্ষরের ন্যায়। কোন সুদূর অতীত কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত অক্ষর জাপানে পূজিত ও রক্ষিত হইয়া আসিতেছে তাহা ভাবিলেও বাঙ্গালীর গর্ব্ব ও আনন্দ হইবার কথা।

রেইসেন (Raisen) নামক এক সংস্কৃতজ্ঞ জাপানী পণ্ডিত ৮০৪ অব্দে চীন যাত্রা করেন এবং কালক্রমে তথাকার "বৌদ্ধ-অনুবাদ প্রতিষ্ঠানের" অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। প্রাজ্ঞ নামক জনৈক ভারতীয় ভিক্ষুর সহিত একযোগে তিনি একটি বৌদ্ধ সূত্রের অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। এই গ্রন্থের জাপানী নাম "শিঙি কো আঙ্গো।" ইহা এখনও জাপানী বৌদ্ধদের অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ। জাপান সেই পুরাকালেই ভারতের ধর্ম্ম ও ভারতের সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীনকালে জাপানীসম্রাট্ সাগার পুত্র কুমার তাকাওকা জাপানী হইতে ভারতবর্ষ যাত্রা করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে কোচিন-চীনের অন্তর্গত লাওস নামক স্থানে রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

খৃষ্টীয় ৩৭২ অব্দে চীন হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম কোরিয়ায় প্রচারিত হয়। চীন হইতে খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম কো-চীন,ফরমোজা, মোঙ্গলিয়া এবং অপর নানারাজ্যে প্রচারিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পরে অল্পকাল মধ্যেই ঐ ধর্ম্ম নেপালে প্রচারিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই ধর্ম্ম তথাকার রাজকীয় ধর্ম্মে পরিণত হয় নাই। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের প্রথম বৌদ্ধরাজ বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থসংগ্রহার্থ নেপালে লোক পাঠাইয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে এশিয়া মহাদেশের সকল রাজ্যে এবং আফ্রিকা ও ইয়ুরোপের কোনো কোনো দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। এই ধর্ম্ম নানাদেশে নানাজাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। চীন ও জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মরূপে রহিয়াছে। কিন্তু একই দেশে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধর্ম্ম নানা আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বৌদ্ধধর্ম্মের উদারনীতি ও মৈত্রী একসময়ে যে আলোকছটার বিকাশ করিয়াছিল, সেই আলোকে সমস্ত এশিয়া মহাদেশ আলোকিত হইয়াছিল। এই ধর্ম্ম যে, এশিয়া মহাদেশে সভ্যতার বিকাশে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

খৃষ্ঠান ধর্ম্মযাজকগণ ইহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করিয়া থাকেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম খৃষ্টধর্ম্মের উপর নানাপ্রকারে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বুদ্ধের জীবনের অনেক ঘটনার সহিত যীশুর জীবনের ঘটনার ঐক্য দৃষ্ট হয়। বুদ্ধের বহুসংখ্যক হিতোপাখ্যান ও উপদেশ যীশুর হিতোপাখ্যান ও উপদেশের সহিত অভিন্ন। কোনো কোনো খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম খৃষ্টধর্ম্ম হইতে ঐ সকল গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে যীশুর জন্মের প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে মিশর ও সিরিয়া প্রভৃতি দেশে সম্রাট্ অশোক ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত ধর্ম্ম-প্রচারকগণ ঐ সকল দেশে বসতিস্থাপন করায় শক্তিশালী বৌদ্ধ সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। আলেকজান্ড্রিয়ার "থেরাপিউটস্" (Theraputs) এবং প্যালেস্তাইনে "এসেনেস" (Essenes) নামে দুইটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধসম্প্রদায় সাগ্রহে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত ছিল।

সিলিং (Schelling) ও সোপেনহারের (Schopenharuer) তুল্য দার্শনিকগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের দ্বারাই পূর্বোক্ত দুই সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক প্লিনির রচনা মধ্যে এই মন্তব্য দৃষ্ট হয় যে, যীশু যখন প্যালেস্তাইনে ধর্ম্ম-প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন তখন এসেনেস বৌদ্ধ সম্প্রদায় তথায় সগৌরবে বিরাজ করিতেছিল। ঐ সকল বৌদ্ধ সাধু ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুর তুল্য চিরকৌমার্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক মঠে বাস করিতেন। ইহাদের প্রভাব ইহুদী সমাজে নিঃসন্দেহ পতিত হইয়াছিল। বৌদ্ধদের সুনীতি, সদাচার, মৈত্রী প্রভৃতি সমস্তই যিশু পরিজ্ঞাত ছিলেন, সুতরাং তিনি ঐ সমস্ত গ্রহণ করিবেন ইহার মধ্যে বিস্ময় বা অগৌরবের কিছুই থাকিতে পারে না। বৌদ্ধ ও খৃষ্টধর্ম্মের অত্যুজ্জ্বল সাদৃশ্যগুলি যাঁহারা আকস্মিক বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের ঐতিহাসিক অজ্ঞতা অশ্রদ্ধেয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "তপোবন" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন —"ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবন সহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠেনি। সেখানে গাছ-পালা নদী-সরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল, সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকাও ছিল—ঠেলাঠেলি ছিল না। অথচ এই ফাঁকার ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয়নি বরঞ্চ তার চেতনাকে আরও উজ্জ্বল করে দিয়েছিল।

"ভারতবর্ষের যে দুই বড় বড় প্রাচীন যুগ চলে গেছে, বৈদিক ও বৌদ্ধযুগ—সেই দুই যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক ঋষিরা নন, ভগবান্ বুদ্ধও কত আম্রবন, কত বেণুবনে তার উপদেশ বর্ষণ করেছেন—রাজপ্রাসাদে তাঁর স্থান কুলায়নি—বনই তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল। সেই অরণ্যবাসনিঃসৃত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়নি।"

বস্তুতঃই বৈদিক ও বৌদ্ধযুগে ভারতের তপঃক্ষেত্র হইতে সভ্যতার ধারা উৎসাকারে উৎসারিত হইয়া নিখিল ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তপোবনবাসী ঋষিদের আশ্রমে বিদ্যার্থী ধনি-দরিদ্র সকলে বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত গমন করিতেন। ঋষি ছাত্রদিগকে অন্ন ও বিদ্যা উভয়ই দান করিতেন, আশ্রমবাসী শিষ্যগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া ধেনু-চারণ, সমিধ, কুশ ও ফল আহরণ, কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন ও বেদ অধ্যয়ন করিত। তখন পুস্তক ছিল না, গুরুর মুখে বেদ শ্রবণ করিয়া শিষ্যগণ উহা শিক্ষা করিত বলিয়া বেদের নাম ছিল শ্রুতি। সেই

প্রাচীনকালের শিক্ষার কোন ইতিবৃত্ত নাই, তবে জাবাল, সত্যকাম, বেদ, আরুণি, উপমন্যু ও উতঙ্ক প্রভৃতি বিদ্যার্থীদের গুরুভক্তির আখ্যানমধ্যে তদানীন্তন শিক্ষাপদ্ধতির কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

পরলোকগত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় নৈমিষারণ্যকে প্রাচীন ভারতের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন —"স্থিরবাহিনী পুণ্যসলিলা গোমতী কঙ্কনের ন্যায় নৈমিষ কাননকে বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। সেই পুরাকালে বহু ঋষি এখানে বাস করিতেন। এখানেই বেদের অধিকাংশ আরণ্যক রচিত হয়। দেশ-দেশান্তরের ঋষিগণ নৈমিষারণ্যে আসিয়া শিক্ষা লাভ করিতেন এবং স্বদেশে গিয়া মঠ স্থাপনপূর্ব্বক লব্ধজ্ঞান প্রচার করিতেন। এইরূপে সমগ্র ভারতে বেদবাণী প্রচারিত হইত।"

অরণ্যের সাধনা ও শিক্ষা এইরূপে জনসমাজের উপর পতিত হইয়া রাজা প্রজা সকলকে কল্যাণবর্ত্মে পরিচালিত করিত। ঋষিদের অধ্যাত্ম প্রভাবে তখন অসীম বলসম্পন্ন ভূপতিগণ কম্পিত হইতেন। বৈদিক যুগের এই শিক্ষাপদ্ধতি বৌদ্ধ যুগেও প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ যুগে ভারতে যে সভ্যতার ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল সাধনানিরত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের নিভৃতনিবাস হইতেই সেই ধারা উত্থিত হইত। নির্জ্জন গিরিগুহা এবং শান্ত-সুন্দর পল্লী ও নগরোপকণ্ঠবাসী বৌদ্ধ-সাধুগণের বিহারগুলিই বৌদ্ধযুগের শিক্ষানিকেতন ছিল।

তক্ষশিলা

তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় বিদ্যামহাপীঠ সমূহের মধ্যে প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ। ভগবান্ বুদ্ধের প্রাদুর্ভাবকালেই এই বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান ছিল। ঐতিহাসিকগণ যে সময়কে বৌদ্ধযুগ আখ্যা প্রদান করেন, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালেই তক্ষশিলায় বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বলিয়া মনে হয়। তক্ষশিলা প্রাচীন গান্ধার

রাজ্যের রাজধানী ছিল। রাওলপিণ্ডি নগরের ২০ মাইল দূরে সরইকালা নামক রেলওয়ে জংশনের অব্যবহিত উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্বে ছয় বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া প্রাচীন তক্ষশিলার ধ্বংসস্তূপ এখনও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ষ্ট্রাবো, প্লিনি, আরিয়ন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রীক লেখকগণ তাঁহাদের গ্রন্থে তক্ষশিলার সমৃদ্ধি ও বিদ্যাগৌরবের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ভুবনবিজয়ী আলেকজাণ্ডারের জন্মের বহু পূর্ব্বেই তক্ষশিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কীর্ত্তি দিগন্তবিশ্রুত হইয়াছিল। ভারতীয় আর্য্যগণ অতি প্রাচীন কালেই এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, জন্মেঞ্জয় এখানে সর্পযজ্ঞ করিয়াছিলেন। হয় তো ঐ কিংবদন্তীর মধ্যে তখনকার আর্য্য-অনার্য্য-বিরোধের তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এইরূপ অনুমিত হয় যে, অত্রত্য বিদ্যায়তন বহুশতবর্ষ অক্ষুণ্ণ প্রতাপে বিরাজ করিয়াছিল। যাঁহার কুটনীতি বলে নন্দবংশ ধ্বংস হইয়াছিল, মৌর্য্যভূপতি চন্দ্রগুপ্তের সেই বিশ্বস্ত মন্ত্রী চাণক্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপণ্ডিত ছাত্র ছিলেন। অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণসূত্র রচনা করিয়া যিনি অমরতা লাভ করিয়াছেন সেই পাণিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ ছাত্র। গান্ধার রাজ্যের শালাতুর গ্রামে পাণিনির নিবাস ছিল। মগধের অন্তর্গত কুসুমপুর গ্রামের বর্ষনামক তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ এক অধ্যাপকের নিকটও তিনি বহুবৎসর ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

গোভরণ (কেহ বলেন ধর্ম্মরক্ষ) ও মাতঙ্গ তক্ষশিলার অপর দুই প্রসিদ্ধ ছাত্র। তাঁহারা খৃষ্টীয় ৬৭ অব্দে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন। তক্ষশিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশ-দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। গুপ্ত রাজাদিগের শাসনসময়ে চীনদেশ হইতে দলে দলে ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার্থ আগমন করিত।

পঞ্চায়ুধ, অসাতমন্ত্র, বরুণ, তিলমুষ্টি প্রভৃতি বৌদ্ধ জাতকে স্থানে স্থানে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, তক্ষশিলা এককালে নিখিল ভারতের সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র ছিল। এখানে বিবিধ ললিত

কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। রিসডেভিডস্ ও জর্জ বুলার এইরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, জাতকে ভগবান্ বুদ্ধের আবির্ভাব ও উহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়কার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ বলা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে তক্ষশিলা পূর্ণগৌরবে বিদ্যমান ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন মহাবগ্গ সঙ্কলিত হইয়াছিল তখনও তক্ষশিলার গৌরব পূর্ব্ববৎ ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে এই নগর সাইথিয়ান রাজাদের রাজধানী ছিল।

রামায়ণ ও মহাভারতে তক্ষশিলার নাম আছে। এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, মহাবীর রামচন্দ্রের ভ্রাতা ভরতের পুত্র তক্ষের নাম হইতে এই নগরের নাম তক্ষশিলা হইয়াছে।

তক্ষশিলাকে বৌদ্ধগণ "তক্কসির" নামে অভিহত করেন। এইরূপ এক কিংবদন্তী আছে যে, বুদ্ধ কোনো এক জন্মে এইস্থলে আপনার শির দান করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক ফাহিয়েন এই কিংবদন্তী ব্যতীত তক্ষশিলা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অপর কোন কথা তাঁহার বিস্তৃত ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করেন নাই। উয়ান চুয়াঙ্এর ভ্রমণ-বিবরণে প্রকাশ যে, তাঁহার ভ্রমণকালে তক্ষশিলায় অনেকগুলি বৌদ্ধ মঠ ছিল কিন্তু তথায় অতি অল্পসংখ্যক মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধ বাস করিতেন।

মার্সল সাহেব তৎপ্রণীত "A Guide to Taxila" গ্রন্থে তক্ষশিলার স্তূপ ও বিহার সমূহের ধ্বংসাবশেষরাজির যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে মনে হয় যে, তক্ষশিলা শিল্পে, ঐশ্বর্য্যে, ধর্ম্মে ও বিদ্যালোচনায় এককালে নিঃসন্দেহে অতি শ্রেষ্ঠ ছিল। তিনি লিখিয়াছেন,—"তক্ষশিলায় যে সকল ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা দেখিতে হইলে ন্যূনকল্পে দুই দিনের দরকার।"

মহাবীর আলেক্জাণ্ডার যখন দেশজয়ার্থ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তখন তিনি তক্ষশিলা অধিকার করেন। সেই সময়ের গ্রীক

ঐতিহাসিকগণের বর্ণনাপাঠে জানা যায় যে, তক্ষশিলা সমৃদ্ধ, জন-বহুল, সুশাসিত রাজ্য ছিল। তখন ঐ দেশে বহুবিবাহ ও সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল।

তক্ষশিলা ভারত সীমান্তে অবস্থিত। ঐ নগর বহুশতাব্দী কেবল ভারতের নহে, সমগ্র এশিয়া মহাদেশের জ্ঞান-পিপাসুদের আশ্রয়স্থল ছিল। চীনদেশের সাহিত্যে তক্ষশিলার উল্লেখ আছে। তখনকার এক রাজপুত্র চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় আসিয়াছিলেন। মহাবগ্‌গে বর্ণিত হইয়াছে যে, জীবক তক্ষশিলায় এক দেশপ্রসিদ্ধ আচার্য্যের নিকট চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। তক্ষশিলা আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার পক্ষে অতিশয় অনুকূল ক্ষেত্র ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। মহাবগ্‌গে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, জীবককে তাঁহার অধ্যাপক মহাশয় এই অনুমতি করেন—"যাও, তুমি কোদালি লইয়া তক্ষশিলার সকল দিকে এক যোজন মধ্যে যত গাছ গাছড়া আছে পরীক্ষা কর, যে সকল গাছ গাছরা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না সেইগুলিই লইয়া আসিও।" জীবক এইরূপ কোন গাছ গাছড়া লইয়া আসিতে পারেন নাই।

তক্ষশিলার ছাত্রদিগকে বহু বিষয় মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া হইত। পরবর্ত্তী কালে নালন্দা ও অপর বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ছাত্রগণ হস্ত-লিপি-গ্রন্থ পাঠ করিতে পাইত। যাহাতে ছাত্রগণ শিক্ষণীয় বিষয় মনে রাখিতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে সূত্রের সাহায্য শিক্ষাদান করা হইত।

ভারতবর্ষের সকল অঞ্চলের সর্ব্বশ্রেণীর ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে যাইত। এখানে কোশলরাজ প্রসেনজিতের মত রাজবংশীয় এবং জীবকের মত সাধারণ লোক সমভাবেই স্থান পাইত। ভারতবর্ষের বহুরাজ্যের রাজপুত্রগণ এখানে ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। এখানে ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববিদ্যা, অর্থশাস্ত্র, ব্যাকরণ, বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষাদান করা হইত। মহাসুতসোম জাতকে উক্ত হইয়াছে যে, তক্ষশিলায় শত শত রাজকুমার

অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতেন। এই স্থলে শিক্ষা অতি উত্তম হইত। পূর্ব্বকালে রাজকুমারগণ তাঁহাদের স্ব স্ব নগরেই অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিতেন কিন্তু ভূপতিগণ তথাপি রাজকুমারদিগকে বহু-দূরবর্ত্তী তক্ষশিলায় পাঠাইতেন; কারণ এখানকার শিক্ষায় তাঁহাদের বৃথা অহঙ্কার চূর্ণ এবং মন উদার হইত। ইহাতে রাজকুমারগণ শীততাপ সহ্য করিতে শিখিতেন এবং সর্ব্বশ্রেণীর লোকের আচার-ব্যবহারের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইতেন।

এইখানে ছাত্রগণ প্রত্যেক বিষয় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট শিক্ষা করিত। ধনী ছাত্রগণ অধ্যাপককে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দিত। দরিদ্র ছাত্রগণ দিবারাত্র গুরুসেবা করিত।

মৌর্য্য-ভূপতি চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদিগকে বিতাড়িত করিয়া তক্ষশিলা ও পাঞ্জাবের অপর সকল স্থান স্বরাজ্যভুক্ত করেন। তাঁহার রাজ্য হিন্দুকুশ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। পিতার জীবদ্দশায় অশোক তক্ষশিলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বসময়ে এই অঞ্চলে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। অশোকের পুত্র কুনাল এই স্থানে বাস করিতেন। অতঃপর কুষাণকুলোদ্ভব কণিষ্ক এদেশের রাজা হন। তাঁহার শাসনকর্ত্তারা এই দেশ শাসন করিতেন। তাঁহাদের কতগুলি মুদ্রা ও উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে। একখানি উৎকীর্ণ লিপিতে 'তক্ষশিলা' নাম অঙ্কিত রহিয়াছে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে তক্ষশিলা "অমন্দ্র" নামে পরিচিত ছিল। তক্ষশিলার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। এখানে অনেকগুলি নদী ও নির্ঝর আছে। ফল ও পুষ্প প্রচুর জন্মে। এখানকার দৃশ্য অতি মনোহর। নগরের উত্তর-পশ্চিমাংশে নাগরাজ এলাপত্রের সরোবর। এই সরোবরের দক্ষিণ-পূর্ব্বে অশোকনির্ম্মিত এক গুহা আছে। নগরের উত্তরাংশে অশোকনির্ম্মিত স্তূপ রহিয়াছে। পর্ব্বদিবসে নাগরিকগণ এই স্তূপ পুষ্প ও আলোকমালায় সুশোভিত করিত।

এখানে যে সকল স্তূপ ও বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে ধর্ম্মরাজিক স্তূপ, কুনাল স্তূপ, শিরকপের মন্দির, জাণ্ডিয়াল

মন্দির, লালচক ও বাদলপুরের বৌদ্ধ বিহার এবং মোহরামোরাডু ও জুলিয়নের প্রসিদ্ধ স্তূপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তক্ষশিলার এই ধ্বংসরাজির বিশালতা এই নগরের গৌরবময়ী পূর্ব্বস্মৃতি দর্শকমাত্রের হৃদয়ে জাগরিত করিয়া দেয়।

নালন্দা

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বিদ্যানুশীলনের ক্ষেত্র ছিল। এইরূপ কথিত আছে যে, মহামতি অশোক মগধের রাজধানী পাটলীপুত্র হইতে ত্রিশ মাইল দূরে ফল্গু-নদীর তীরে এক বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণ করেন। নরেন্দ্র অশোকনির্ম্মিত এই বিহার "নরেন্দ্রবিহার" নামে অভিহিত হইত। এই বিহারই পালিভাষায় নালন্দা নামে উক্ত হইত। কেহ কেহ বলেন বিহারের দক্ষিণে আম্রোদ্যানের সরোবরে এক 'নাগ' বাস করিত। সেই নাগের নাম হইতে বিহারের নাম নালন্দা হইয়াছে। উত্তরকালে শঙ্কর ও মুদ্গলগোমীনামক দুই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ঐ বিহারকে বর্দ্ধিত করিয়া নবভাবে নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের সুপ্রসিদ্ধ অনুরাগী সুপণ্ডিত নাগার্জ্জুন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পরে কিয়ৎকাল শঙ্করের নিকট শাস্ত্রাভ্যাস করিয়াছিলেন। অতঃপর নাগার্জ্জুন কৃষ্ণানদীর তীরবর্ত্তী সুধন্যকটক নামক স্থলে স্বয়ং এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। আধুনিক পাটনা জিলায় বরগাঁও গ্রামে নালন্দার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এককালে এইরূপ সুবৃহৎ হইয়া উঠিয়াছিল যে, তথায় দশ সহস্র ভিক্ষু ও ছাত্র বাস করিতেন। অধ্যাপক ও ছাত্রদের প্রত্যেকের বাসের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ঘর ছিল। প্রত্যেকটি ঘর দৈর্ঘ্যে ১২ হাত ও প্রস্থে ৮ হাত, ভারতবর্ষের নানা প্রদেশস্থ নৃপতিবর্গের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দানে এই মহাবিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সহস্র পাঁচশত দশজন অধ্যাপক

পঞ্চাশ প্রকার সূত্রে ও শাস্ত্রে, পাঁচশত দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ত্রিশ প্রকার সূত্রে ও শাস্ত্রে এবং এক সহস্র তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক বিশ প্রকার সূত্রে ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। যিনি এই অধ্যাপকমণ্ডলীর উপর অধ্যক্ষতা করিতেন তাঁহাকে সমস্ত ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধশাস্ত্রে অসামান্য পারদর্শিতা লাভ করিতে হইত, সুতরাং অনন্যসুলভ বিদ্যাগৌরবসম্পন্ন না হইয়া কেহ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষতা লাভ করিতে পারিতেন না। শীলভদ্রনামক বঙ্গদেশীয় এক সুপণ্ডিত ব্যক্তি এক সময়ে এই গৌরবময় আসন অলংকৃত করিয়াছিলেন। তিনি সমতট প্রদেশের এক রাজার পুত্র। সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক উয়ান চুয়াঙ্ এই বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া নালন্দায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বিহার প্রদেশে অবস্থিত হইলেও বাঙ্গালীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়কে 'নিজস্ব' বলিয়া মনে করিতেন। এখানে বহু বাঙ্গালী অধ্যাপক ও ছাত্র ছিলেন। তারপর বঙ্গের পালরাজাদিগের শাসনকালে বিহার তাঁহাদের শাসনাধীন ছিল। তখন তাঁহারা নালন্দা মঠের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতেন।

উয়ান চুয়াঙ্ ৫ বৎসর নালন্দায় ছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন —"উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত এই বিহার চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে পরমরমণীয় শোভনশ্রী ধারণ করিয়াছিল, এখানে আটটি চতুষ্কোণ কক্ষ আছে, এখানকার বিহারসমূহের অভ্রভেদী উচ্চ গম্বুজ ও চূড়া প্রভাত-শিশিরে অদৃশ্য হইয়া থাকে। ইহাদের বাতায়ন হইতে বায়ুর গতি ও মেঘের খেলা এবং উচ্চ ছাদ হইতে চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ উত্তমরূপে প্রত্যক্ষ করা যায়।"

অত্রত্য ছায়া-নিবিড় নিকুঞ্জ ও উদ্যানের শোভাদর্শনে পরিব্রাজক মোহিত হইয়াছিলেন। এখানে সরোবরসমূহের স্বচ্ছ-সলিলে নীল-কমল প্রস্ফুটিত হইত, রক্তবর্ণ কুসুমে কনকতরু ঝল্‌মল্ করিত, শ্যামল পত্র-শোভিত আম্রবৃক্ষরাজি আনন্দপ্রদ ছায়া বিস্তার করিত।

পরিব্রাজক বলেন,—"এই সময়ে ভারতবর্ষে সহস্র সহস্র সঙ্ঘারাম ছিল, কিন্তু নালন্দার গৃহরাজি সৌন্দর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে এবং উচ্চতায়

অপর সকলকে অতিক্রম করিয়াছিল।”

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করিতেন দেশের নরপতি ও সমৃদ্ধ ব্যক্তিগণ। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা বিদ্যার্থী হইয়া গমন করিত তাহাদিগকে কোনপ্রকার ব্যয় প্রদান করিতে হইত না। তক্ষশিলা এবং নালন্দার মত বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্বত্র ছিল না কিন্তু দেশের সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্রবৃহৎ সঙ্ঘারামে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই সকল বিদ্যালয়ে ভারতীয় সর্ব্বপ্রকার দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা প্রদান করা হইত। এখানে শত শত সুপণ্ডিত অধ্যাপক শিক্ষাদানে নিরত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন দর্শন ও ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইত তেমন গণিত ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। চুয়াঙ নালন্দায় রাজকীয় মানমন্দির ও জলঘড়ি দেখিয়াছেন। তথাকার জলঘড়ি বিশুদ্ধ সময় প্রকাশ করিত।

চারুকলা ও হস্তশিল্প শিক্ষাদানের নিমিত্ত বিদ্যালয় ছিল। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ভাস্কর্য্যে, প্রতিমাচিত্রণে এবং মন্দিরের আলঙ্কারিক চিত্রকার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন। চারুকলায় যাঁহারা কুশলী ছিলেন তাঁহারা হস্তশিল্পকে হেয় বলিয়া মনে করিতেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ বিহারগুলি বিদ্যালোচনার কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। নালন্দা বিদ্যায়তনের খ্যাতি সমস্ত এশিয়া মহাদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। নালন্দা প্রাচীন ভারতের, কেহ কেহ মনে করেন সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম বিদ্যায়তন ছিল। এখানকার “রত্নোদধি” নামক গ্রন্থালয়ে হীনযান ও মহাযান এই দুই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের যাবতীয় গ্রন্থ যত্নপূর্ব্বক সংগৃহীত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থালয় অতিবৃহৎ ও উচ্চতায় নয় তলা ছিল। ইহা আকারে বুদ্ধগয়া মন্দিরের তুল্য ছিল। তিব্বত দেশে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, নালন্দামঠের অপ্রাপ্তবয়স্ক সাধুরা তৈথিক সাধুদিগকে অপমানিত করায় তাঁহারা ক্রোধান্ধ হইয়া গ্রন্থালয় দগ্ধ করিয়া ফেলেন। এইরূপ প্রকাশ যে, কতগুলি গ্রন্থ নাকি অলৌকিক

উপায়ে অগ্নিদগ্ধ হয় নাই। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। চীনপরিব্রাজক উয়ান চুয়াঙ্ তৎপূর্ব্বে সপ্তম শতাব্দীতে যখন ভারতে আগমন করিয়াছিলেন তখন নালন্দা অক্ষুণ্ণ গৌরবে বিরাজিত ছিল।

অজন্তা

খৃষ্টপূর্ব্ব কোন এক শতাব্দীতে সম্ভবতঃ কতিপয় বৌদ্ধ সাধু অজন্তার পার্ব্বত্য অঞ্চলে কয়েকটি স্বাভাবিক গুহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তত্রত্য নৈসর্গিক শোভা সাধনার অনকূল বলিয়া তাঁহারা তথায় বাস করিয়া নিভৃত সাধনার শান্তি উপভোগ করিতেন। কালক্রমে ইঁহাদের খ্যাতি দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বহু বদান্য ব্যক্তি তখন অজন্তার গুহাখননে আনুকুল্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে তথায় অনেকগুলি গুহা খনিত হইল। উত্তরকালে অজন্তা ভারতের অন্যতম বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র হইয়া উঠিল। অজন্তার অনেকগুলি গুহায় অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা বাস করিতেন।

সারনাথ

অতি প্রাচীনকাল হইতেই বারাণসী শিক্ষা ও ধর্ম্মালোচনার সুপ্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। সকল মতাবলম্বী সাধুগণ এখানে স্ব স্ব ধর্ম্মমতের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিতে আসিতেন। ভারতের হৃদ্‌পিণ্ড-তুল্য এই কেন্দ্রভূমিতে যে সত্য জয়যুক্ত হইত তাহা নিখিল ভারতের সর্ব্বত্র অবলীলাক্রমে প্রসারিত হইয়া পড়িত। ভগবান্ বুদ্ধ বোধিলাভ করিয়া এই পুণ্যভূমিতেই তাঁহার নবধর্ম্ম প্রচারকল্পে আগমন করিয়াছিলেন। কালক্রমে বারাণসী ও তন্নিকটবর্ত্তী সারনাথ বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। সারনাথ যে একদিন বৌদ্ধ সাধুদের তপস্যা ও বিদ্যাদানের প্রসিদ্ধ স্থল ছিল তাহাতে আর কোন

সন্দেহ করিবার হেতু নাই। ফাহিয়েন যখন এই পুণ্যতীর্থে আগমন করিয়াছিলেন তখন দেড় সহস্র বিদ্যার্থী এখানে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন।

বিক্রমশিলা

নালন্দার অধঃপতনের পর পাল রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ওদন্তপুরী ও বিক্রমশিলা বিদ্যায়তন জাগিয়া উঠিয়াছিল। নালন্দা, বিক্রমশিলা ওদন্তপুরীর পুস্তকালয় হইতেই তিব্বতীয় বৌদ্ধগণ হস্ত-লিপি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐ সকল হস্তলিপি গ্রন্থ হইতেই আধুনিক সুবিস্তৃত তিব্বতীয় সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে। ওদন্ত-পুরীর গ্রন্থালয় আকারে নালন্দার গ্রন্থালয়কেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। এখানে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বহু হস্তলিপি গ্রন্থ ছিল। ১২০২ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার যখন বিহার জয় করেন তখন তাঁহার সেনাপতি এই গ্রন্থালয়ের ধ্বংস সাধন করেন।

বৌদ্ধ বিদ্যায়তন বিক্রমশিলা প্রাচীন মগধ রাজ্যে অবস্থিত ছিল। এইরূপ কথিত আছে যে, পালবংশীয় দ্বিতীয় ভূপতি ধর্ম্মপাল ইহার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পিতা গোপাল পালবংশের প্রথম রাজা। গোপাল, ভূপাল ও লোকপাল এই তিন নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। কানিংহাম সাহেব বলেন, ধর্ম্মপাল অষ্টম শতাব্দীর মধ্য বা শেষ ভাগে রাজত্ব করিতেন।

সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশ হইতে প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক উয়ান চুয়াঙ্ ও ই-চিঙ্ ভারতবর্ষে বৌদ্ধতীর্থ দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে বিক্রমশিলার উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বিদ্যায়তন স্থাপিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মেতিহাস গ্রন্থে প্রকাশ, মগধ রাজ্যে গঙ্গাতটবর্ত্তী প্রদেশে এক প্রশস্তাগ্র উচ্চ শৈলের উপর বিক্রমশিলা বিহার অবস্থিত। উক্ত ছয়দ্বারী বিহারের মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত প্রাঙ্গণে আট সহস্র লোকের

সম্মিলন হইতে পারিত। বিক্রমশিলা বিহারটি যে, অতি সুশোভন ছিল তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ তিব্বতবাসীরা এই বিহারকে আদর্শ করিয়া তাহাদের সঙ্ঘারামগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছে। বিক্রমশিলা বিদ্যায়তনে যোগশাস্ত্র, মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র, চিকিৎসা এবং বিবিধ বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম যখন তান্ত্রিকতায় পরিণত হয় তখন বিক্রমশিলা তন্ত্রশিক্ষার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। নানাদেশ হইতে বিদ্যার্থীরা এই স্থলে আগমন করিয়া বিদ্যালোচনা করিতেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬টি মহাবিদ্যালয় এবং ১০৮ জন অধ্যাপক ছিলেন। পণ্ডিতেরা এই বিদ্যায়তনে দ্বাররক্ষকের কার্য্য করিতেন। যে বিদ্যার্থী দ্বাররক্ষক পণ্ডিতদিগকে বিচারে সন্তুষ্ট করিতে না পারিতেন তিনি এই বিদ্যায়তনে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। অন্যত্র কোন কোন শাস্ত্রালোচনা করিয়া যাঁহারা পাণ্ডিত্য লাভ করিতেন তাঁহারাই এখানে উচ্চতর বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ পাইতেন। উয়ান চুয়াঙ্‌ বলেন,—এই প্রকারে পরীক্ষা করিয়া ছাত্র গ্রহণের প্রথা নালন্দায়ও প্রচলিত ছিল।

ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে বিক্রমশিলা সঙ্ঘারামের অধিনায়ক ছিলেন শ্রীবুদ্ধ জ্ঞানপদ। নরপতি নরপাল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানপদকে বিহারেব প্রধান পুরোহিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিব্বতরাজ এই পুরোহিত মহাশয়কে ধর্ম্মসংস্কার কার্য্যের উপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাকে তিব্বতে আহ্বান করিয়াছিলেন। ১০২৮ খৃষ্টাব্দে দীপঙ্কর তিব্বত গমন করিয়া সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন বক্তিয়ার বিহার জয় করেন, তখন মুসলমানেরা বিক্রমশিলা ধ্বংস করে। পালবংশীয় শেষ নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের শাসনকালে এই শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়াছিল। ঐ সময়ে শাক্যশ্রী বিক্রমশিলার প্রধান পুরোহিত ছিলেন। তিনি প্রাণভয়ে প্রথমে উড়িষ্যায়, পরে সেখান হইতে তিব্বতে পলায়ন করেন।

ভাগলপুর হইতে চব্বিশ মাইল দূরবর্ত্তী পাথরঘাটা নামক স্থানে বিক্রমশিলা সঙ্ঘারাম অবস্থিত ছিল, এইরূপ অনুমিত হইতেছে।

সপ্তম অধ্যায়

জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদ

জ্যোতিষ

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে সকল বিদ্যা আলোচিত হইত জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদ তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৈদিক যুগের জ্যোতিষীরা অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফাল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, সাতি, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রাবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদা, উত্তরভাদ্রপদা ও রেবতী এই সাতাসটি গ্রহমণ্ডলে চন্দ্রের পৃথিবীপ্রদক্ষিণপথকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। সূর্যের কর্কট ও মকরক্রান্তি-প্রয়াণ প্রভৃতি তথ্য সেই অতীতকালের জ্যোতিষীরা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পর্যবেক্ষণের ফলে আরও বহু জ্যোতিষশাস্ত্রের তথ্য তাঁহারা অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। বৈদিক ও বিজ্ঞানযুগের কোন জ্যোতিষ-গ্রন্থ পাওয়া যায় না। এক্ষণে প্রাচীনতম যে সকল জ্যোতিষ-গ্রন্থ পাওয়া যায় সেই সমস্ত বৌদ্ধযুগেই রচিত হইয়াছিল।

হিন্দুলেখকগণের রচনামধ্যে বৌদ্ধযুগের অষ্টাদশখানি সিদ্ধান্ত বা জ্যোতিষ-গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে। ঐ সকলের অধিকাংশই এক্ষণে পাওয়া যায় না। ঐ সিদ্ধান্তগুলির নাম ঃ—

(১) পরাশর সিদ্ধান্ত
(২) গর্গ ”
(৩) ব্রহ্ম ”
(৪) সূর্য্য ”
(৫) ব্যাস ”
(৬) বশিষ্ঠ ”
(৭) অত্রি ”
(৮) কশ্যপ ”
(৯) নারদ ”
(১০) মরীচি সিদ্ধান্ত
(১১) মনু ”
(১২) অঙ্গিরস ”
(১৩) রোমক ”
(১৪) পুলিশ ”
(১৫) চ্যবন ”
(১৬) যবন ”
(১৭) ভৃগু ”
(১৮) সোম ”

ঐতিহাসিক অধ্যাপক ওয়েবর বলেন, পরাশর ভারতীয় জ্যোতিষী-দের মধ্যে প্রাচীনতম। তারপরে গর্গ। বেদপঞ্জীমধ্যে পরাশরের নাম পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। পরাশরতন্ত্র নামক গ্রন্থে পরাশরের উপদেশাবলী রহিয়াছে। পৌরাণিক যুগে এই পুস্তকের বিলক্ষণ আদর ছিল। বরাহমিহির পরাশর-তন্ত্র হইতে বহু বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই সকল বচন হইতে মনে হয় পরাশরের রচনা অধিকাংশ অনুষ্টুভে লিখিত হইয়াছিল। পরাশর লিখিয়াছেন,—"যবন বা গ্রীকগণ পশ্চিম ভারতে বাস করিতেন।" ইহা হইতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, যবন বা গ্রীকগণ খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষে অবস্থান করিতেন।

গ্রীক পণ্ডিতদের সাহচর্য্যে ভারতীয় জ্যোতিষীরা জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনায় বিশেষরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জ্যোতিষী গর্গ সম্বন্ধে অতি সামান্যই জ্ঞাত হইতে পারা গিয়াছে। তিনি গ্রীকদের ভারত-আক্রমণ বর্ণনা করিয়াছেন। উহা খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর ঘটনা। তিনি গ্রীকদিগকে "ম্লেচ্ছ" বলিলেও ইহা লিখিয়াছেন—"যবনেরা (গ্রীক) ম্লেচ্ছ, কিন্তু তাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাঁহারা ব্রাহ্মণ-জ্যোতিষীদের অপেক্ষা বহুগুণে সম্মানের পাত্র। তাঁহারা ঋষি।"

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির "পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকা" নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন সেই গ্রন্থ (১) ব্রহ্মা বা পিতামহ (২) সূর্য্য বা সৌর (৩) বশিষ্ঠ (৪) রোমক এবং (৫) পুলিশ এই পঞ্চসিদ্ধান্ত অবলম্বনে রচিত।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত ভারতীয় জ্যোতিষীদের সুপ্রসিদ্ধ প্রামাণ্য গ্রন্থ। কিন্তু এক্ষণে ঐ গ্রন্থ যেরূপ আকারে দৃষ্ট হয় উহার সহিত মূল গ্রন্থের কতদূর সামঞ্জস্য আছে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। বরাহ-মিহিরের টীকাকার উৎপল খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর অন্যতম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। তিনি সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে তাঁহার রচনায় ছয়টি শ্লোক

উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। আধুনিক গ্রন্থে সেই শ্লোকগুলির একটিও দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্ত চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রহদের সংস্থান, চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ, গ্রহ ও নক্ষত্রদের সমসূত্র সংযোগ, তাহাদের উদয়াস্ত, পৃথিবীর সূর্য্যপ্রদক্ষিণ পথের সহিত তার মেরুদণ্ডের অবনতি, চন্দ্রের পৃথিবীপ্রদক্ষিণপথের সহিত পৃথিবীর মেরুদণ্ডের অবনতি, এবং জ্যোতিষ আলোচনার নানাপ্রকার যন্ত্র-নির্ম্মাণ-তথ্য এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ঐতিহাসিক আল্ বরুণি (Alberuni) বলেন, বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত ব্রহ্মগুপ্তের রচিত। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তই লিখিয়াছেন—ঐ সিদ্ধান্ত বিষ্ণুচন্দ্র সংশোধিত করিয়া লিখিয়াছেন। তিনি অতি প্রাচীনকালের জ্যোতিষী।

আল্‌বরুণি ও ব্রহ্মগুপ্ত দুই জনেই লিখিয়াছেন যে, রোমক সিদ্ধান্ত যিনি প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহার নাম শ্রীসেন।

আল্‌বরুণি লিখিয়াছেন যে, পুলিশ সিদ্ধান্ত একখানি তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। তিনি বলেন, পলেস (Paules) নামক এক গ্রীক পণ্ডিত উহার রচয়িতা। কিন্তু অধ্যাপক ওয়েবার উহা স্বীকার করেন না, তিনি বলেন, সম্ভবতঃ প্রসিদ্ধ গ্রীক জ্যোতিষী পলাস আলেকজেণ্ড্রিনাস (Alexandrinus) ঐ গ্রন্থের প্রণেতা।

উল্লিখিত পঞ্চসিদ্ধান্ত ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির সংকলন করিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পঞ্চসিদ্ধান্তিকা রচনা করিয়াছিলেন।

ভারতীয় হিন্দুগণ গ্রীকপণ্ডিতদের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্রের তথ্য অল্পাধিক অবগত হইলেও জ্যোতিষগণনার সূক্ষ্মতা ও যাথাতথ্যে তাঁহারা তাঁহাদের গুরু গ্রীকপণ্ডিতদিগকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। যে-সকল ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত সহৃদয়তার সহিত ভারতীয় হিন্দু-সভ্যতার আলোচনা করিয়াছেন এবং অপক্ষপাতভাবে ভারতীয়দিগকে তাঁহাদের প্রাপ্য গৌরব অর্পণ করিয়াছেন অধ্যাপক কোলব্রুক (Cole Brooke) তাঁহাদের মধ্যে সুবিখ্যাত। তিনি লিখিয়াছেন—"সেই সুদূর অতীত কালেই ভারতীয় হিন্দুগণ জ্যোতিষশাস্ত্রে কথঞ্চিৎ

উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেবল চন্দ্র সূর্য্য নহে, গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহারা তদনুসারে তাঁহাদের লৌকিক ও ধর্ম্মপঞ্জিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ভারতীয় জ্যোতিষীরা চন্দ্রের গতিবিধি গণনায় অধিকতর সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রের পৃথিবীপ্রদক্ষিণপথ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা নক্ষত্রপুঞ্জকে সাতাশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। চন্দ্রের ভূ-প্রদক্ষিণ-পথ খৃষ্টপূর্ব্ব ১২০০ অব্দে মহাকাব্যযুগে নির্ণীত হইয়াছিল।"

বেদে যেমন অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি ভূতগণের বন্দনাগান আছে, সেইরূপ সূর্য্য চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্রাদির স্তবস্তুতি রহিয়াছে। লোকে গগনমণ্ডলের এই জ্যোতিষ্কদিগকে ধর্ম্মভাবে অভিভূত হইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিত। সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতি তদানীন্তন জ্যোতিষীদের বিশেষ পরিচিত ছিল। লৌকিক ও ধর্ম্মপঞ্জিকায় চন্দ্র সূর্য্যের মত বৃহস্পতির গতিবিধিরও উল্লেখ আছে।

পৃথিবী যে পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে আমরা সেই কক্ষপথে সূর্য্যকে ভ্রমণ করিতে দেখি। এই পথটিকে রাশিচক্র বলে। গ্রীক জ্যোতিষীদের অনুসরণে ভারতের জ্যোতিষীরা রাশিচক্রকে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন এই বারো ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

ঐতিহাসিকগণ ভারতইতিহাসের যে যুগকে "পৌরাণিক" আখ্যা প্রদান করিতেছেন সেই যুগে বৌদ্ধধর্ম্মের ও বৌদ্ধসংঘের প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইতেছিল, কিন্তু তখনও হিন্দু ও বৌদ্ধগণ পাশাপাশি মিত্রভাবে বাস করিতেছিলেন। বরাহমিহির পৌরাণিক যুগের জ্যোতিষী। তৎপ্রণীত বৃহৎসংহিতা গ্রন্থ ডাক্তার কারন্ সম্পাদন করিয়াছেন। বৃহৎসংহিতায় ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের সহিত ভগবান্ বুদ্ধের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

পৌরাণিক যুগের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী আর্য্যভট্ট খৃষ্টীয় ৪৭৬ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ গীতিকাপাদ, গণিত-পাদ, কালক্রিয়াপাদ, গোলপাদ এই কয়েক খণ্ডে বিভক্ত। আর্যভট

সুস্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন—“পৃথিবী স্বীয় মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্ত্তন করিতেছে।” চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণের যথার্থ কারণও তিনি বিবৃত করিয়াছিলেন।

আর্য্যভট্ট লিখিয়াছেন “নদীপথে আমরা যখন নৌকাযোগে চলিতে থাকি তখন যেরূপ দেখি যে, তীরস্থ বৃক্ষগুলি বিপরীত দিকে চলিতেছে আকাশের নক্ষত্রগুলির গতি ঐরূপ।”

আর্য্যভট্ট চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সেই যুক্তি সুধী-সমাজ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। রঘুবংশ কাব্যের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ৪০এর শ্লোকে কালিদাস এক উপমামধ্যে বলিয়াছেন—“যাহা বস্তুতঃ পৃথিবীর ছায়া লোকে তাহাকেই অকলঙ্ক চন্দ্রের কলঙ্ক জ্ঞান করিয়া থাকে।” আর্য্যভট্টের গোলপাদে মেষ-বৃষাদি দ্বাদশ রাশিচক্রের নাম রহিয়াছে। তিনি ঐ গ্রন্থে পৃথিবীর পরিধি ৩৩০০ যোজন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই গণনাও যথার্থ পরিমাপের কাছাকাছি, সুতরাং ইহা উপেক্ষিত হইতে পারে না।

মহামতি অশোকের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে আর্য্যভট্ট জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর সাহিত্য-বিজ্ঞানের আলোচনা কেবল বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনী নগরে আবদ্ধ ছিল না।

বরাহমিহির অবন্তীনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন।

ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত •সপ্তম শতাব্দীতে (৬২৮ অব্দে) রচিত।

চিকিৎসাশাস্ত্র

ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, সম্রাট্ অশোক তাঁহার সুবিস্তৃত রাজ্যের সর্ব্বাংশে মনুষ্য ও পশুর চিকিৎসার্থ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং বৌদ্ধযুগে ভারতে

চিকিৎসাবিদ্যা আলোচিত হইয়াও উন্নতি লাভ করিয়াছিল এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

ভারতীয়-চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার চরক ও সুশ্রুত বৌদ্ধযুগেই তাঁহাদের গ্রন্থ-রচনা করিয়াছিলেন। উত্তরকালে তাঁহাদের গ্রন্থাবলী পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইলেও বৌদ্ধযুগেই তাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণয়ন ও প্রচার করিয়াছিলেন।

ইয়ুরোপীয় বহু পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত আর্য্যসভ্যতার আলোচনা করিয়া গ্রীকদিগকেই সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের স্রষ্টা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে প্রচেষ্ট হইয়া থাকেন। ইঁহাদের এই অন্ধ সংস্কার অপক্ষপাত বিচারের বিরোধী। আধুনিক লেখকগণের চেষ্টা যাহাই হউক গ্রীকেরা কিন্তু কদাচ এমন দাবী করেন না যে, প্রাচীন সভ্যতার তাঁহারাই জনক।

গ্রীক ঐতিহাসিক নিয়ারকাস (Nearchus) বলেন—"গ্রীক চিকিৎসকগণ সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে চিকিৎসা করিয়া বাঁচাইতে পারিতেন না, কিন্তু হিন্দু চিকিৎসকেরা এইরূপ ব্যক্তিকে আরোগ্য করিয়া দিতে পারিতেন।" প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এরিয়ান (Arian) বলেন—"গ্রীকেরা অসুস্থ হইলে হিন্দু ব্রাহ্মণদিগের শরণাপন্ন হইতেন, ইঁহারা আশ্চর্য্য উপায়ে, এমন কি অমানুষিক উপায়ে চিকিৎসা-সাধ্য সমস্ত রোগই আরোগ্য করিয়া দিতেন।"

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রীসের ডিওস্‌করাইডিস (Dioscorides) একখানি ভেষজ পুস্তক প্রণয়ন করেন। প্রাচীন চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার এই পুস্তকেই বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮৩৭ অব্দে লণ্ডন নগরস্থ কিংস্‌ কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার রয়লি (Dr. Royle) হিন্দুচিকিৎসাশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব আলোচনা করেন। তিনি তাঁহার প্রবন্ধে ডিওস্‌করাইডিসের গ্রন্থ আলোচনা করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, উক্ত গ্রীক গ্রন্থকার তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন হিন্দুগণের চিকিৎসাগ্রন্থ হইতে বহু তথ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দেও ভারতে চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচনা হইত

কিন্তু তখনকার আলোচনার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। সমগ্র চিকিৎসা-বিদ্যা "আয়ুর্ব্বেদ" নামে উক্ত হইত। ডাক্তার উইলসন এই বিষয় আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন ঃ—"সমগ্র চিকিৎসাশাস্ত্র শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদ, রসায়ন, বাজীকরণ এই আটভাগে বিভক্ত ছিল।

বৌদ্ধযুগে অপর সকল বিজ্ঞানের মত চিকিৎসা-বিজ্ঞানেরও বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এই যুগে চরক ও সুশ্রুত তাঁহাদের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসাশাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উক্ত গ্রন্থদ্বয় পরবর্ত্তীকালে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকিবে। অষ্টম শতাব্দীতে হারুণ অল রসিদের শাসনকালে আরবে উক্ত চিকিৎসা-শাস্ত্রীয় গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদ হইয়াছিল। ঐ অনুবাদের সাহায্যে হিন্দু চিকিৎসা-বিদ্যার বিবরণ ইয়ুরোপে প্রচারিত হইয়াছিল।

অষ্টম অধ্যায়

বুদ্ধ ও বৌদ্ধজাতক

জীব যতদিন মুক্তিলাভ না করে ততদিন তাহাকে বারংবার নানা আকারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ উক্ত হইয়াছে ভগবান্ বুদ্ধ নির্ব্বাণলাভের পূর্ব্বে ৫৫৫ বার নানা আকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌতম বুদ্ধ যখন মহাবোধি লাভ করেন তখন তিনি এমন অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, সৃষ্টির প্রথম হইতে কতবার জন্মিয়াছেন, কোথায় জন্মিয়াছেন, কি প্রকারে তিনি মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন সমস্তই তাঁহার দিব্যদৃষ্টির গোচর হইয়াছিল। তিনি যখন লোকহিতার্থ সাধারণের নিকট তাঁহার কল্যাণকর সদ্ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেন তখন অনেক সময়ে আপনার পূর্ব্বজীবনের আখ্যান বিবৃত করিয়া লোকের মনে ধর্ম্ম ও সুনীতিমূলক উপদেশ মুদ্রিত করিয়া দিতেন।

জাতকের আখ্যানগুলির বক্তা স্বয়ং ভগবান্ বুদ্ধ। সুতরাং ঐ আখ্যানোক্ত ঘটনাগুলি যে তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বেও ঘটিয়াছিল তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। জাতকের আলোচনা করিয়া সুবিজ্ঞ ঐতিহাসিক রিসডেভিডস্ ও জর্জ্জ বুলার প্রভৃতি সুধীগণ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, জাতকগুলির মধ্যে বুদ্ধের আবির্ভাবকালের এবং তাঁহার অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে উত্তরভারতে সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা জানিতে পারা যায়।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নারায়ণ পত্রিকায় "জাতক ও অবদান" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"পালিভাষার গ্রন্থে

৫৫৫টি জাতক আছে অর্থাৎ ভগবান্ বুদ্ধ আপনার ৫৫৫টি পূর্ব্ব জন্মের কথা বলিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃতে একখানি জাতকমালা আছে। সে খানি আর্য্যশূরের প্রণীত। ইহাতে ৩৪টি মাত্র জাতক আছে। এই পুস্তক হীনযানের কি মহাযানের বলিতে পারা যায় না। কেন না হীনযানের লোকেও সংস্কৃত লিখিত। মহাযানের লোকের কিন্তু জাতকের উপর তত আস্থা ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ জাতকমালা ছাড়িয়া দিলে উহাদের আর জাতকের বই নাই। এই জাতকমালা আবার যখন মহাযানীরা পড়েন তখন উহার নাম হয় বোধিসত্ত্বাবদানমালা। মহাযানীরা আর্য্যশূরের জাতকমালা বুদ্ধের বচন করিয়া তুলিয়াছেন। মহাযানে তাহার নাম বোধিসত্ত্বাবদান বা বোধিসত্ত্বাবদানমালা। ইহা দেখিলে মনে হইবে যে, মহাযানীরা জাতক শব্দটা পছন্দ করিতেন না। উহারা জাতকের স্থলে অবদান শব্দ ব্যবহার করিতেন।”

দান, শীল, প্রজ্ঞা, মৈত্রী প্রভৃতি পারমিতা সমূহের মাহাত্ম্য বর্ণনা করাই বৌদ্ধজাতকসমূহের উদ্দেশ্য। রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তৎপ্রণীত জাতকের দ্বিতীয় খণ্ডের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন— “*বোধিসত্ত্ব কোনো জন্মে দান, কোনো জন্মে শীল, কোনো জন্মে* প্রজ্ঞা, কোনো জন্মে মৈত্রী ইত্যাদি পারমিতার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং সেই সঞ্চিত পুণ্যবলে তিনি অন্তিমকালে অভিসম্বুদ্ধ হইয়া পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বুদ্ধ-শিষ্যগণও স্ব-স্ব সাধ্যানুসারে এই সমস্ত পারমিতার অনুষ্ঠান করুন তাহা হইলে তাঁহারাও জন্ম-জন্মান্তরে উন্নতিলাভ করিয়া শেষে নির্ব্বাণলাভ করিতে পারিবেন। সরল ভাষায় এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করাই জাতকের উদ্দেশ্য।”

জাতকের পাঠকগণ অবশ্যই জ্ঞাত আছেন যে, প্রত্যেক জাতকেরই তিনটি অংশ আছে। গৌতম বুদ্ধ কি জন্য, কোন প্রসঙ্গে আখ্যান বিবৃত করিয়াছেন জাতকের ভূমিকা অংশে তাহা বর্ণিত হইয়াছে, ইহাকে বর্ত্তমান কথা বলা হয়। দ্বিতীয় অংশে মূল জাতক বিবৃত

হইয়াছে ইহাকে অতীত বস্তু বলা হয়। তৃতীয় অংশে অতীত ঘটনার সহিত বর্ত্তমানের মিল দেখাইয়া "সমবধান" করা হইয়াছে।

রিসডেভিড্‌স তাঁহার বৌদ্ধ ভারত গ্রন্থে জাতকের ভূমিকাভাগ, আখ্যানঅংশ ও সমবধান বুঝাইয়া দিবার জন্য "ন্যগ্রোধমৃগ জাতক" সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।

ন্যগ্রোধ-মৃগজাতকের ভূমিকাভাগ অর্থাৎ বর্ত্তমান কথা এইরূপ ঃ—ভগবান্ বুদ্ধ জেতবনে স্থবির কুমার কাশ্যপের জননী-সম্বন্ধে এইরূপ বলেন। কুমার কাশ্যপের মাতা রাজগৃহের কোনো ধনী শ্রেষ্ঠীর কন্যা। শৈশব হইতেই তিনি ভোগ-নিস্পৃহ ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছিল, তিনি মাতাপিতার অনুমতি লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণের অভিলাষিণী হইলেন, কিন্তু জনকজননী তাঁহাদের একমাত্র সন্তানের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা বালিকাকে বিবাহ দিলেন। তাঁহার রূপে-গুণে পতিগৃহে সকলে সন্তুষ্ট হইলেন কিন্তু তাঁহার মন হইতে বৈরাগ্য দূর হইল না।

এক উৎসবদিনে সকলে যখন বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়াছিল তখন শ্রেষ্ঠীকন্যা সামান্য বেশেই ছিলেন। স্বামী ইহার কারণ জানিতে চাহিলেন। বালিকা বলিলেন, এই দেহ ক্ষণভঙ্গুর, ইহা দুঃখের আকর। স্বামী বলিলেন—তুমি যদি দেহকে এমন দোষযুক্ত মনে কর তাহা হইলে প্রবজ্যা গ্রহণ কর না কেন? স্ত্রী বলিলেন—স্বামিন্, আপনার অনুমতি পাইলে আজই আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারি।

শ্রেষ্ঠীকন্যা দেবদত্তের স্থাপিত ভিক্ষুণীনিবাসে আশ্রয় পাইলেন। কিন্তু এই কন্যা যেদিন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন সেই দিনই সসত্ত্বা ছিলেন, তাহা তাঁহার স্বামী কিংবা তিনি জানিতেন না। ক্রমে তাঁহার যখন গর্ভলক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইল তখন দেবদত্ত বিনা অনুসন্ধানে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। শ্রেষ্ঠীকন্যা জেতবন বিহারে ভগবান্ বুদ্ধের নিকট গমন করিলেন।

তথাগত শ্রেষ্ঠীকন্যাকে শুদ্ধচরিত্রা বুঝিতে পারিয়াও তাঁহার হিতার্থে এক সভার আয়োজন করিলেন। সভায় ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা সকলে সমবেত হইলেন। ভগবান্ বুদ্ধের নির্দেশক্রমে স্থবির উপালি সভা স্থানে শ্রেষ্ঠীকন্যার বিবরণ বিবৃত করেন। উপালির আদেশে উপাসিকা বিশাখা যবনিকার অন্তরালে গমন করিয়া কন্যার সমস্ত অঙ্গ পরীক্ষা করিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে ইহা ব্যক্ত করেন যে, শ্রেষ্ঠীকন্যা প্রব্রজ্যা গ্রহণের পূর্ব্বেই গর্ভবতী হইয়াছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধের উপাশ্রয়ে এই কন্যা যথাকালে এক পুত্র প্রসব করেন। রাজা প্রসেনজিত এই শিশুকে রাজভবনে লইয়া গিয়া পুত্রবৎ পালন করেন। এইজন্য শিশু "কুমার কাশ্যপ" নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

একদিন সায়ংকালে জেতবনে ভিক্ষুগণ এই প্রসঙ্গে দেবব্রতের নিষ্ঠুরতা এবং পরমকারুণিক বুদ্ধের সুবিচার ও দয়ার কথা বলাবলি করিতেছিলেন। তখন ভগবান্ বুদ্ধ বলেন,—অতীত জন্মেও দেবদত্ত কুমার কাশ্যপ ও তাঁহার জননীর সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখনও আমি ইহাদিগের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলাম।

অতঃপর ভগবান্ বুদ্ধ ভিক্ষুদের অবগতির জন্য তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন এক জন্মের একটি আখ্যান বিবৃত করেন। উহাই জাতকের মূল অংশ বা অতীত বস্তু। "ন্যগ্রোধ-মৃগজাতকের" এই অংশ এইরূপ ঃ—

পুরাকালে ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসী রাজ্যে রাজত্ব করিতেন তখন বোধিসত্ব তথায় হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই হরিণের গায়ের রং সোনার মত, শৃঙ্গের রং রূপার মত, এবং চক্ষু দুইটি মণির মত উজ্জ্বল ছিল। এই হরিণ "ন্যগ্রোধ-মৃগরাজ" নামে উক্ত হইতেন। তিনি পাঁচশত সঙ্গিসহ অরণ্যে বিচরণ করিতেন। নিকটে আরও একটি সোনার বর্ণ হরিণ ইহার মত পঞ্চশত অনুচরসহ বিচরণ করিত। সেই হরিণের নাম ছিল "শাখামৃগ"।

রাজা ব্রহ্মদত্ত মৃগমাংস প্রিয় ছিলেন। তাঁহার জন্য প্রত্যহ মৃগ বধ করিতে হইত। নগর ও জনপদবাসীরা মৃগ সংগ্রহের ক্লেশ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য বনের সমস্ত হরিণ তাড়াইয়া রাজার উদ্যান মৃগ-পূর্ণ করিয়া দিল। রাজা উদ্যানে গমন করিয়া শত শত হরিণ দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি ন্যগ্রোধমৃগরাজ এবং শাখা-মৃগের আশ্চর্য্য রূপ দেখিয়া তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন।

অতঃপর প্রত্যেক দিন উদ্যানের এক একটি মৃগকে শরবিদ্ধ করিয়া বধ করা হইত। ইহাতে সমস্ত মৃগগুলি ভীত এবং কোন কোন মৃগ আহত হইয়া ছুটাছুটি করিত। বোধিসত্ত্ব শাখামৃগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, তাহাদের দুই দল হইতে পালাক্রমে এক একটি হরিণ ধর্ম্মগণ্ডিকার উপর গ্রীবা স্থাপন করিবে এবং রাজার পাচক সেই মৃগকে বধ করিবে।

অনন্তর একদিন এক গর্ভিণী হরিণীর বার উপস্থিত হইল। সে দলপতি শাখামৃগকে গিয়া বলিল—"আমি সসত্ত্বা আমাকে ছাড়িয়া দিবার অনুমতি করুন।" শাখামৃগ বলিল—"ইহা তোমার অদৃষ্টের ফল, আমি তোমার পালা অন্যের স্কন্ধে চাপাইতে পারিব না।" অনন্যোপায় হইয়া সেই হরিণী বোধিসত্ত্বের নিকট গেল। সমস্ত কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন—তুমি স্বীয় দলে ফিরিয়া যাও, আমি তোমার প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করিতেছি।

যথাসময়ে পাচক ধর্ম্মগণ্ডিকার নিকট উপস্থিত হইয়া বোধি-সত্ত্বকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। পাচক জানিত, রাজা এই মৃগরাজকে অভয় দিয়াছেন। সে তৎক্ষণাৎ রাজাকে এই সংবাদ দিল। পাত্র-মিত্রসহ রাজা সেখানে আসিয়া বোধিসত্ত্বকে প্রশ্ন করিলেন,—মৃগরাজ, আমি ত তোমাকে অভয় দিয়াছি, তবে কেন তুমি গণ্ডিকায় মাথা দিয়াছ? বোধিসত্ত্ব উত্তর করিলেন, মহারাজ, আজ যে মৃগীর পালা ছিল, সে সসত্ত্বা, তাহার প্রাণ রক্ষার্থ আমি অন্যের প্রাণ নাশ করিতে পারি না, সেই জন্য নিজের প্রাণ দিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিব স্থির করিয়াছি।

রাজা কহিলেন,—মৃগরাজ, আপনি যে মৈত্রী, প্রীতি ও করুণার পরিচয় প্রদান করিলেন, তাহা ত মানুষের মধ্যে দেখা যায় না, আপনি উঠুন, আমি প্রসন্ন মনে আপনাকে ও সেই মৃগীকে অভয় দিলাম।

মৃগরাজ বলিলেন—ইহাতে কেবল দুইটি মৃগ অভয় পাইল। রাজন্, অন্য মৃগদের ভাগ্যে কি হইবে?

"তাহাদিগকেও অভয় দিলাম।"

"আপনার উদ্যানবাসী মৃগেরা অভয় পাইল, কিন্তু অপর মৃগদের দশা কি হইবে?"

"তাহাদিগকেও অভয় দিলাম।"

"মৃগকুল নিস্তার পাইল বটে, অপর চতুষ্পদ জীবের ভাগ্যে কি ঘটিবে?"

"তাহাদিগকেও অভয় দিলাম।"

"চতুষ্পদ প্রাণীরা অভয় পাইল, কিন্তু পাখীদের কি দশা হইবে?"

"পাখীদিগকেও অভয় দিলাম।"

"পাখীরা অভয় পাইল বটে, কিন্তু মৎস্য ও অন্য জলচরদের দশা কি হইবে?"

"মাছ ও অন্য জলচরদিগকে অভয় দিলাম।"

এইরূপে সকল প্রাণীর জন্য অভয় আদায় করিয়া বোধিসত্ত্ব গণ্ডিকা হইতে মাথা তুলিলেন এবং রাজাকে পঞ্চশীল শিক্ষা দিলেন।

গার্ভিণী হরিণী যথাকালে একটি পরম সুন্দর শাবক প্রসব করিল। এই শাবক বড় হইয়া শাখামৃগের সহিত খেলিতে যাইত। তখন মাতা তাহাকে এই উপদেশ দিতেন,—তুমি শাখামৃগের সংসর্গে থাকিও না, তুমি এখন হইতেই ন্যগ্রোধমৃগের দলে মিশিবে।

আখ্যান শেষ করিয়া ভগবান্ বুদ্ধ এই বলিয়া বক্তব্যের 'সমবধান' করিলেন—দেবদত্ত ছিল শাখামৃগ, তাহার শিষ্যগণ, শাখামৃগের অনুচর সকল, এই ভিক্ষুণী ছিলেন হরিণী, কুমার কাশ্যপ তাঁহার শাবক, তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম ন্যগ্রোধমৃগ।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হইতে পাঠকগণ জাতকের প্রকৃতি এবং উহার বিভিন্ন অংশের ধারণা করিতে পারিবেন। জাতকের ভূমিকা মূল জাতকের অপ্রধান অংশ বলিয়া উক্ত হইতে পারে।

জাতকের সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তিব্বত দেশের বৃহৎ জাতকমালায় ৫৬৫টি জাতক বর্ণিত হইয়াছে। অধ্যাপক ফৌস্‌বোল মহোদয় প্রণীত 'জাতকার্থবর্ণনা' নামক পালি গ্রন্থে জাতক সংখ্যা ৫৪৭।

জাতকের প্রাচীনত্বে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐতিহাসিক রিস্‌ডেভিডস্‌ প্রমুখ সুধীগণ বলেন—"সমস্ত জাতক এক সময়ে রচিত হয় নাই।" রচনার পার্থক্য, মূল জাতকের গাথাসমূহের ভাষাগত প্রভেদ প্রভৃতি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জাতকসমূহ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা রচিত হইয়াছে। বিনয় পিটক ও সূত্র পিটকের মধ্যে কতগুলি জাতক সন্নিবেশিত আছে। বৌদ্ধগণ বলেন—ভগবান্‌ বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ লাভের পরে সপ্তপর্ণী গুহায় যে মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল সেই সভায় ত্রিপিটক সংকলন করা হইয়াছিল। কিন্তু বিদেশীয় অনেক পণ্ডিত মনে করেন, খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৭০ অব্দে বৈশালী নগরে যে মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হয় ত্রিপিটক সেই সভায় সংকলিত হইয়াছিল। এই মত গ্রহণ করিলেও ইহা সুনিশ্চিত যে খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ ৩৭০ বৎসর পূর্ব্বে জাতকগুলি সংকলিত হইয়াছিল। কিন্তু জাতকবর্ণিত আখ্যানগুলি অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার পরিচয় প্রদান করে তদ্‌বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রিস্‌ডেভিডস্‌ বলেন—নন্দ ও মৌর্য্য ভূপতিগণের শাসনকালে পাটলীপুত্র নিখিল ভারতের রাজধানী হইয়াছিল। জাতকে নন্দ ও মৌর্য্য বংশের কিংবা পাটলীপুত্রের নাম দৃষ্ট হয় না। মৌর্য্য ভূপতিগণ নিখিল ভারতব্যাপী যে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন জাতক সেই রাজ্যের উল্লেখ করে নাই। জাতক-আখ্যানে মদ্র, পাঞ্চাল, কোশল, বিদেহ, কাশী, বিদর্ভ প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যবর্ণিত রাজ্য-

সমূহের নৃপতিদের উল্লেখ রহিয়াছে। অন্ধ্র, পাণ্ড্য, কেরল প্রভৃতি রাজ্যের উল্লেখ নাই।

জাতক আখ্যানে কোন বিশিষ্ট শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রাধান্য কীর্ত্তিত হয় নাই, কিন্তু বহু জাতকে তক্ষশিলা বিদ্যায়তনের বিশিষ্টতা বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ যুবক ও রাজপুত্রগণ বিদ্যাশিক্ষার জন্য গান্ধার রাজ্যের রাজধানী তক্ষশিলায় গমন করিতেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে এই স্থান ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রালোচনার প্রধান কেন্দ্র ছিল ইহা একরূপ সুনিশ্চিত।

জাতক-আখ্যানে যে সময়ের বর্ণনা করা হইয়াছে তখন ভারতবর্ষ অনেকগুলি খণ্ড-ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। "উলুক" জাতকে উক্ত হইয়াছে, সৃষ্টির প্রথম কল্পে মানুষেরা সমবেত হইয়া এক সুশ্রী, সুলক্ষণযুক্ত, পরম সুন্দর পুরুষকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীনকালে এতদ্দেশে রাজপদ বংশানুগ ছিল না। যিনি যোগ্য বিবেচিত হইতেন তিনিই দল বা সম্প্রদায়ের নেতা বৃত হইতেন। তবে কালক্রমে রাজপদ বংশানুগ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তবু অনেক স্থলে রাজার অভিষেক সময়ে প্রজা ও অমাত্যগণের মত গহণ করা হইত। "পাদাঞ্জলি" জাতকে দেখা যায় যে, বিজ্ঞ মন্ত্রীদের বিচারে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের জড়মতি ও আলস্যপরতন্ত্র পুত্র পাদাঞ্জলি রাজপদের অযোগ্য বিবেচিত হইলেন এবং ঐ স্থলে রাজার ধর্ম্মার্থানুশাসক অমাত্য বোধিসত্ত্ব রাজপদ প্রাপ্ত হন। "গ্রামণী-চণ্ড" জাতকে উক্ত হইয়াছে যে, বারাণসীরাজ জনসন্ধের মৃত্যু হইলে তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্র আদর্শকুমারকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। এইরূপ আখ্যান হইতে ইহা বুঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতে, সর্ব্বত্র না হইলেও স্থানে স্থানে রাজার অভিষেকে লোকমত ও রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মতি গ্রহণ করা হইত।

লোকভয় ও ধর্ম্মভয়ই সর্ব্বকালে শক্তিমান ব্যক্তিদিগকে উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। প্রাচীন ভারতের আদর্শ

ভূপতিগণ দান, শীল, পরিত্যাগ, অক্রোধ, অবিহিংসা, ক্ষান্তি, আৰ্জ্জব, মৰ্দ্দব, তপঃ, অবিরোধন এই দশ প্রকার গুণ-ভূষিত হইতেন। যে সকল রাজা এইরূপ সদ্‌গুণ-সম্পন্ন ছিলেন তাঁহারা কদাচ প্রজাপীড়ন করিতেন না।

যাঁহারা উক্তরূপ গুণ-সম্পন্ন নহেন, এমন রাজারাও আপনাদিগকে প্রজা সাধারণের সৰ্ব্বময় প্রভু বলিয়া মনে করিতেন না। "তৈলপাত্র" জাতকে বর্ণিত হইয়াছে, তক্ষশিলার এক রাজা কোন রূপবতী যক্ষিণীর রূপে মোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। যক্ষিণী এই রাজাকে বিনাশ করিয়াছিল। কিন্তু সেই মোহাবিষ্ট রাজাও যক্ষিণীর অন্যায় অনুরোধের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—"ভদ্রে, সমস্ত রাজ্যের উপর আমার নিজেরই কোন প্রভুত্ব নাই। আমি সমস্ত প্রজার প্রভু নহি। যাহারা রাজদ্রোহী কিংবা দুরাচার কেবল তাহাদিগেরই দণ্ড বিধান করিতে পারি। আমি যখন সমস্ত প্রজার প্রভু নহি তখন তোমাকে তাহাদের আধিপত্য কিরূপে দিব ?"

তখন দেশে স্থানে স্থানে অত্যাচারী রাজাও ছিল। "মহাপিঙ্গল" জাতকে এইরূপ এক উৎপীড়ক রাজার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। লোকে যেমন ইক্ষুযন্ত্রে ইক্ষু পেষণ করে কাশীরাজ মহাপিঙ্গল সেইরূপ নানা প্রকার উৎপীড়নে প্রজাদিগকে পেষণ করিতেন। রাজারা যখন এইরূপ অত্যাচারী হইতেন তখন সময়ে সময়ে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া রাজাকে বধ করিয়া নূতন রাজা নিৰ্ব্বাচন করিত। "সত্যংকিল" জাতকে এইরূপ এক অত্যাচারী রাজার নিধনের বিবরণ আছে। বারাণসী নগর-বাসীরা উৎপীড়ক রাজাকে বধ করিয়া বোধিসত্ত্বকে রাজপদে বরণ করিয়াছিল।

ভগবান্ বুদ্ধের আবির্ভাব কালে কিংবা তাঁহার আবির্ভাবের পূৰ্ব্বে ভারতবর্ষের সকল স্থানে রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল এইরূপ মনে করিবার হেতু নাই। গৌতম বুদ্ধের পিতা শুদ্ধোদন কপিলাবাস্তুর রাজা ছিলেন এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ তিনি শাক্যবংশীয়দিগের মধ্যে প্রধান পুরুষ ছিলেন বলিয়া তাহাদের

অন্যতম দলপতির কার্য্য করিতেন। শুদ্ধোদন ব্যতীত আরও বহু ব্যক্তি "রাজা" বলিয়া উক্ত হইতেন। "একপর্ণ" জাতকের বর্ত্তমান বস্তুকথায় অর্থাৎ ভূমিকা-অংশে উক্ত হইয়াছে—"বৈশালী নগরের সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। এই নগর এক এক ক্রোশ অন্তর তিনটি প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। সাত হাজার সাতশত সাতজন রাজা সর্ব্বদা ইহার শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। উপরাজ, সেনাপতি ও ভাণ্ডাগারিকের সংখ্যাও ঐ প্রকার ছিল।" সম্ভবতঃ বৈশালীর সমস্ত ক্ষত্রিয় সমবেত হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই "রাজা" উপাধি ছিল।

জাতকের বর্ত্তমান বস্তুকথায় বুদ্ধের প্রাদুর্ভাব-কালের বহু তথ্য রহিয়াছে। তখন আর্য্যাবর্ত্তে বারাণসী, কৌশম্বী, সাকেত, শ্রাবস্তী, রাজগৃহ ও চম্পা এই ছয়টি বিশেষ প্রসিদ্ধ নগর ছিল।

রায় সাহেব শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তৎপ্রণীত জাতকের দ্বিতীয় খণ্ডে "জাতকে পুরাতত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"রাজকর সম্বন্ধে জাতকে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থার উল্লেখ নাই। কোন কোন জাতকে দেখা যায় রাজা ইচ্ছামত কর বৃদ্ধি করিতেন। লোকে যে সময়বিশেষে নগদ টাকা না দিয়া উৎপন্ন শস্যের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ রাজকরস্বরূপ দিত "কুরুধর্ম্ম" জাতকে তাহার উল্লেখ আছে। যে কর্ম্মচারী রাজার পক্ষ হইতে শস্য মাপিয়া লইতেন তাঁহার উপাধি ছিল "দ্রোণ-মাপক"।

"জাতকে পুরোহিত, অর্থধর্ম্মানুশাসক, সর্ব্বার্থচিন্তক, সর্ব্বকৃত্য-কার, বিনিশ্চয়ামাত্য, অর্ঘ্যকার, সেনাপতি, ভাণ্ডাগারিক, ছত্রগ্রহ, অসিগ্রহ, রজ্জুক, শ্রেষ্ঠী, দ্রোণমাতা, হিরণ্যক, সারথি, দৌবারিক, হস্তিমঙ্গলকারক, গজাচার্য্য, গ্রামভোজক, বলিপ্রতিগ্রাহক (শুল্ক-সংগ্রাহক), নগরগুপ্তিক, রাজবৈদ্য প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীর নাম আছে। এতন্মধ্যে গ্রামভোজক, বলিপ্রতিগ্রাহক, রাজবৈদ্য, নগরগুপ্তিক ব্যতীত অপর সকলেই অমাত্য নামে অভিহিত হইতেন।"

"তখন পুরোহিতেরা ব্রাহ্মণ ছিলেন। সাধারণতঃ অর্থ-

ধর্ম্মানুশাসক, সর্ব্বার্থ-চিন্তক, সর্ব্বকৃত্যকার ও বিনিশ্চয়ামাত্য এই সকল মন্ত্রিপদে ব্রাহ্মণজাতীয় লোক নিযুক্ত হইতেন।”

পুরোহিতপদ সাধারণতঃ বংশগত ছিল। রাজার সহিত পুরোহিতের কুলক্রমাগত প্রীতির বন্ধন থাকিত। জাতকে দুষ্ট পুরোহিতের কথা আছে। “পাদকুশল-মানব” জাতকে দেখা যায় প্রজাপীড়নে পুরোহিতই রাজার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন।

পুরোহিত পদের ন্যায় শ্রেষ্ঠী (Banker or Treasurer) পদও বংশানুগ ছিল। রাজকীয় শ্রেষ্ঠীরা সম্ভবতঃ রাজ্যের আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যে রাজাকে সাহায্য করিতেন। রাজকোষে অর্থের অভাব হইলে রাজাকে ঋণও দিতেন। তাঁহাদিগকে রাজদরবারে উপস্থিত থাকিতে হইত।

“গ্রাম-ভোজক” কর্ম্মচারীর সহিত সেকালে পল্লীবাসীদিগের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই কর্ম্মচারীই পল্লীর শান্তি রক্ষা করিতেন। দস্যুতস্করের হাত হইতে পল্লীবাসীদিগকে রক্ষা করা ইহার কর্ত্তব্য ছিল। গ্রাম-ভোজক পল্লীবাসীদের নিকট হইতে রাজকর আদায় করিতেন। স্থানে স্থানে এই কর্ম্মচারী অত্যাচারী হইতেন ; তখন রাজা ইহাকে কর্ম্মচ্যুত করিতেন। “খরস্বর” জাতকে এইরূপ এক দুষ্ট রাজকর্ম্মচারীর বিবরণ বর্ণিত আছে। ঐ কর্ম্মচারী দস্যুদের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের দ্বারা গ্রাম লুণ্ঠন করাইত। ইহার কু-কীর্ত্তি রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি তাহাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন।

সেকালে রাজকর্ম্মচারীরা পল্লীবাসীদের বিবাদের মীমাংসা করিতেন। গ্রাম-ভোজকেরাই নিম্নতম বিচারক ছিলেন। কোন ব্যক্তি উৎকট অপরাধ করিলে “বিনিশ্চয় মহামাত্র” নামধেয় কর্ম্মচারীরা তাহার বিচার করিতেন। ইহাদের বিচারে যাহারা নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইত তাহারা মুক্তি পাইত। কিন্তু যাহারা অপরাধী সাব্যস্ত হইত তাহাদিগকে “ব্যবহারিক” নামধারী কর্ম্মচারীর নিকট পাঠান হইত। ব্যবহারিকদের উপর যথাক্রমে সূত্রধার, অষ্টকুলক (আটকুলের লোক-

দ্বারা গঠিত বিচারকদল—বর্ত্তমান জুরীর স্থানীয়), সেনাপতি, উপরাজ এবং রাজা এই সমস্ত উর্দ্ধতন বিচারক ছিলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী ধার্য্য হইলে রাজারা তাহাকে প্রবেণি পুস্তক অর্থাৎ নজীরের বহির ব্যবস্থামতে দণ্ড দিতেন। রাজা ভিন্ন বোধ হয় আর কেহ প্রাণদণ্ড দিতে পারিতেন না।

রাজাকে প্রায় সকল দেশেই ঈশ্বরের অংশ বলিয়া মনে করা হইত। রাজার এইরূপ সম্মান জাতকে নানাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। "গ্রামণীচণ্ড" জাতকে অপরাধী গেরেপ্তারের যে প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অতি অদ্ভুত সন্দেহ নাই। লোকে একটা ঢিল বা একখানা খাপ্‌রা তুলিয়া অপরাধীকে বলিল—"ঐ দেখ রাজদূত, এস তোমাকে রাজার নিকট যাইতে হইবে।" অপরাধী তৎক্ষণাৎ সেই লোকের সঙ্গে সঙ্গে রাজ সমীপে গমন করিত। বৌদ্ধযুগে সর্ব্বত্র রাজাকে ঠিক দেবতার মত মনে করা হইত ইহা সত্য নহে।

মহাবস্তু অবদানে মনুষ্য ও রাজপদ সৃষ্টির তথ্য বর্ণিত আছে। মনুষ্য সৃষ্টির পরে যখন ছোট বড় নানা বিষয় লইয়া মানুষের মধ্যে বিরোধ ঘটিতেছিল তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল—"আইস আমরা একজন বলবান্, বুদ্ধিমান্, সকলের মন যোগাইয়া চলে এমন লোককে আমাদের ক্ষেত্র রাখিবার জন্য নিযুক্ত করি। তাহাকে আমরা সকলে ফসলের অংশ দিব। সে অপরাধের জন্য দণ্ড দিবে, ভাল লোককে রক্ষা করিবে, আর আমাদের ভাগমত ফসল দেওয়াইয়া দিবে। তাহারা একজন লোক বাছিয়া লইল। তাহাকে তাহারা ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ দিতে রাজি হইল। সকলের সম্মতিক্রমে সে রাজা হইল, এই জন্য তাহার নাম হইল "মহাসম্মত"।

রাজা যে ঈশ্বরের অংশ—এই মতটি অধিক দেশে চলিত। রাজা যে প্রজার চাকর একথা অনেকেই বলিতে সাহস করে না। কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে এই মত অনেকদিন চলিয়াছিল। চন্দ্রকীর্ত্তি খৃষ্টের পঞ্চম শতকে বলিয়াছেন ঃ—

"গণদাসস্য তে গর্ব্বঃ ষড়্‌ভাগেন ভৃতস্য কঃ"

"তুমি ত লোকের দাস, ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ মাহিনাই তোমার জীবিকা। তুমি আবার গুমর কর কি ?"*

কেবল রাষ্ট্রনীতি নহে, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি বহুবিষয়ক কৌতূহলপূর্ণ তথ্যে জাতক পূর্ণ রহিয়াছে। "ভীমসেন", "গুণ" ও "মদীয়ক" জাতকে উৎকৃষ্ট বস্ত্রের উল্লেখ রহিয়াছে। গুণজাতকে উল্লেখ আছে যে, কোশলরাজ নারীদিগকে যে শাড়ী দিয়াছিলেন তাহা এমন উত্তম যে, এক এক খানির মূল্য সহস্র মুদ্রা।

"শীলবান নাগ" ও "কাষায়" জাতকে গজদন্ত শিল্পের; "অসদৃশ" ও "শরভঙ্গ" জাতকে শৃঙ্গ নির্ম্মিত দ্রব্যের; "সূচী" জাতকে লৌহ শিল্পের; "কুশ" জাতকে স্বর্ণনির্ম্মিত দ্রব্যের; "অনীলচিত্ত" জাতকে কাষ্ঠশিল্পের এবং "বভ্রু" জাতকে প্রস্তরশিল্পের বর্ণনা রহিয়াছে।

জাতক পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অপর সকল দেশের মত প্রাচীন ভারতে দাসত্ব-প্রথা প্রচলিত ছিল। ক্রীতদাস এবং গর্ভদাস (Born Slaves) ব্যতীত আরও দুই শ্রেণীর দাস এই দেশে ছিল। কেহ কেহ অন্নবস্ত্রের জন্য সমৃদ্ধ ব্যক্তির দাসত্ব স্বীকার করিত; কেহ কেহ দস্যু ভয়ে ভীত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য শক্তিমানের দাস হইত। "বিদুর পণ্ডিত", "কুলায়ক", "নামসিদ্ধিক", "নন্দ", "দুরাজান", "শত্তুভস্ত্রা", "বিশ্বন্তর" প্রভৃতি জাতকে দাসত্ববিষয়ক নানা কথা আলোচিত হইয়াছে। তখন দাসের মূল্য একশত কার্ষাপণের অধিক ছিল না।

*** মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত "নারায়ণ" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে।**

নবম অধ্যায়

আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা

কোনো কোনো বিদেশীয় সুধী এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ধর্ম্ম ও দর্শনাদি সম্বন্ধেই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন ; কিন্তু লোকে কি প্রকারে তাহাদের জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে, দেশে কি প্রকারে অর্থ সঞ্চিত হইতেছে, কি প্রকারে সেই অর্থ সমাজ মধ্যে বিভক্ত হইতেছে এই সকল প্রশ্নের ধারাবাহিক কোনো আলোচনা দৃষ্ট হয় না ; কেবল প্রসঙ্গতঃ কোনো কোনো স্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে। অধ্যাপক জিমার (Professor Zimmer), ডাক্তার ফিক্ (Dr. Fick) ও অধ্যাপক হপকিন্স্ (Professor Hopkins) এই বিষয়টি বেদ, মহাকাব্য ও জাতক অবলম্বনে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন।

মগধরাজ অজাতশত্রু একবার ভগবান্ বুদ্ধের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন ঃ—

মহাত্মন্, আপনি সংসার ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় কি লাভ হইয়াছে ? অপর সকল লোকে যে-সকল শিল্প বা জীবিকাব্রত গ্রহণ করে তদ্দ্বারা তাহারা কিছু-না-কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। এই উপায়ে তাহারা ব্যক্তিগতভাবে সুখলাভ করিতেছে এবং পরিজনবর্গকেও সুখী করিতেছে। কিন্তু মহাত্মন্, আপনি সংসার ত্যাগ করিয়া যে সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করিলেন তদ্দ্বারা আপনি কোন্ আশু সুফল লাভ করিলেন ?

অজাতশত্রু তাঁহার বক্তব্য মধ্যে (১) মাহুত (২) অশ্বপাল (৩) সারথি (৪) ধানুকী (৫-১৩) নয় শ্রেণীর সৈন্য (১৪) দাস (১৫) পাচক (১৬) ক্ষৌরকার (১৭) অনুচর (১৮) মোদক (১৯) মালাকর (২০) রজক (২১) তন্তুবায় (২২) ঝুড়ি-নিৰ্ম্মাতা (২৩) কুম্ভকার (২৪) কেরাণী (২৫) হিসাবলেখক এ সকল শিল্পী ও কৰ্ম্মীদের উল্লেখ করিয়াছিলেন।

রাজার সহিত প্রত্যহ যে-সকল শিল্পী ও কৰ্ম্মীব দেখা হইতে পারে এই তালিকা মধ্যে তাহাদের নামই আছে।

প্রাচীন কালের অপর কোন কোন গ্রন্থে আঠার প্রকার শিল্পীর বিবরণ পাওয়া যায়। ইহারা যথারীতি সম্প্রদায়বদ্ধ হইয়া বাস করিত।

(১) সূত্রধর—ইহারা কাষ্ঠ দ্বারা কেবল বাক্স, আসন প্রভৃতি প্রস্তুত করিত এমন নয়; ইহারা গৃহ, নানাপ্রকার যন্ত্র ও জলযান নিৰ্ম্মাণ করিত।

(২) কৰ্ম্মকার—ইহারা নানা ধাতু দ্বারা বিবিধ দ্রব্য নিৰ্ম্মাণ করিত। লৌহ দ্বারা ইহারা লাঙ্গল, কুড়ুল, নিড়ানি, করাত, ছুরি এবং অপর নানাপ্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিত। লৌহ দ্বারা সূক্ষ্ম সূচীও নিৰ্ম্মিত হইত। 'ইহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা নানা দ্রব্য ও অলঙ্কার তৈয়ার করিত।

(৩) প্রস্তর শিল্পী—ইহারা ঘরের ও জলাশয়ের সোপান, কাষ্ঠনিৰ্ম্মিত গৃহের ভিত্তি, খোদিত স্তম্ভ, প্রস্তরের বাটী ও বাসন প্রভৃতি নিৰ্ম্মাণ করিত।

(৪) তন্তুবায়—ইহারা কেবল সাধারণ পরিধেয় বস্ত্র বয়ন করিত এমন নহে; ইহারা অতি সূক্ষ্ম মস্‌লিন বস্ত্র বয়ন করিয়া উহা বিদেশে চালান করিত। ইহারা অতি মূল্যবান্ রেশমী বস্ত্র, নানা প্রকার কম্বল ও আসন প্রস্তুত করিত।

(৫) চৰ্ম্মকার—ইহারা নানাপ্রকার পাদুকা প্রস্তুত করিত।

ইহারা নানা কারুকার্য্য-খচিত পাদুকা এবং নানাপ্রকার দ্রব্য তৈয়ার করিত।

(৬) কুম্ভকার—ইহারা গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য্য থালা, বাটী, বাসন প্রভৃতি নানাপ্রকার বস্তু প্রস্তুত করিত এবং সময়ে সময়ে ঐ সকল দ্রব্য ফেরি করিত।

(৭) গজদন্ত শিল্পী—ইহারা নিত্য ব্যবহার্য্য নানা জিনিষ এবং বহু মূল্যবান্ কোন কোন দ্রব্য নির্ম্মাণ করিত।

(৮) কাপড়ে রঙ্ করার কার্য্য—তাঁতীরা যে কাপড় তৈয়ার করিত এক শ্রেণীর শিল্পী সেই সকল কাপড় নানারঙে রঙীন করিয়া দিত।

(৯) মণিকর—ইহারা মণিমাণিক্য দ্বারা নানা আকারের অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিত। শাক্যস্তূপে সেকালের বহুপ্রকারের রত্নালঙ্কার পাওয়া গিয়াছে।

(১০) মৎস্যজীবী—ইহারা নদীতে মৎস্য ধরিয়া বিক্রয় করিত। সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার কথা প্রাচীন সাহিত্যে কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না।

(১১) কসাই—প্রাচীন গ্রন্থে কসাইখানার উল্লেখ আছে।

(১২) ব্যাধ ও শিকারী—ইহারা বন্য প্রাণী বধ করিয়া এবং নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ সংগ্রহ করিয়া সেই সমস্ত বিক্রয়ার্থ নগরে লইয়া আসিত।

(১৩) সূপকার ও মোদক—এই শ্রেণীর লোক জন-সংখ্যায় বহু ছিল।

(১৪) ক্ষৌরকার—ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত। ইহারা নানাপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায় করিত এবং ধনীদের সুশোভন শিরস্ত্রাণ সুসজ্জিত করিয়া দিত।

(১৫) মালাকর ও পুষ্প-বিক্রেতা।

(১৬) নাবিক—ইহারা বড় বড় নদী ও সমুদ্রে নৌ-চালনা করিত।

(১৭) ঝুড়ী-নির্ম্মাতা।

(১৮) চিত্রকর।

এই সকল শিল্প ও কৃষিকার্য্য দ্বারাই দেশের অধিকাংশ লোক জীবিকার্জ্জন করিত। কিন্তু সেই প্রাচীনকালে এই দেশে জল ও স্থলপথে বণিক্‌গণ তাহাদের পণ্যদ্রব্য বহন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত। স্থলপথে শকটে এবং নদীপথে ও সমুদ্রের উপকূল দিয়া ক্ষুদ্র-বৃহৎ জলযানে বাণিজ্য-সম্ভার বাহিত হইত। তখন নির্ম্মিত পথ কিংবা সেতু ছিল না। পণ্যপূর্ণ শকট মন্থরগতিতে জঙ্গল ও ক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তী সংকীর্ণ পথ দিয়া যাতায়াত করিত। শকটগুলি কখনও ঘণ্টায় দুই মাইলের অধিক চলিতে পারিত না।

অতি প্রাচীনকালে এই দেশে মুদ্রার প্রচলন ছিল না। তখন পণ্যের বিনিময়ে পণ্যের আদান প্রদান হইত। কিন্তু ভগবান্‌ বুদ্ধের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্ব হইতেই এই দেশে মুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল। রৌপ্য মুদ্রা তখন ছিল না। নির্দ্দিষ্ট ভার বিশিষ্ট ধাতু খণ্ডেই প্রধানতঃ জিনিষের মূল্য স্থির করা হইত। তখন কহাপণ বা কার্যাপণেরই ব্যবহার ছিল। জাতকে নিক্‌খ (নিষ্ক), সুবণ্ণ (সুবর্ণ), হিরণ্য, কহাপণ (কার্ষাপণ), কংস (কর্ষ বা কাংস্য), পাদ, মাসক (মাষা), কাকণিকা (কাকিণী), সিপ্পিকা প্রভৃতি মুদ্রা কিংবা মুদ্রাবৎ ব্যবহৃত বস্তুর নাম পাওয়া যায়।

এখন বড় বড় নগরে অভাবের যে বীভৎস দৃশ্য দেখা যায়, প্রাচীন ভারতে কুত্রাপি তেমন অভাব ছিল বলিয়া মনে হয় না। তখন কোন স্বাধীন ব্যক্তি অর্থ লইয়া পরের কার্য্য করিতে প্রায়শঃ সম্মত হইত না।

তখন একদিকে যেমন তীব্র দারিদ্র্য ছিল না, অন্যদিকে তেমন অতিশয় সমৃদ্ধের সংখ্যাও অধিক হইতে পারিত না। তক্ষশিলা, শ্রাবস্তী, কাশী, রাজগৃহ, বৈশালী, কোশম্বী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগরে তখন ক্রোড়পতি বণিক্‌ অতি অল্পই ছিল। তখন ভূম্যধিকারীর উপদ্রপ ছিল না। সাধারণতঃ পল্লীবাসীরা আপনাদের নির্ব্বাচিত মণ্ডলের নায়কতায় স্বীয় জমি চাষ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প কার্য্য করিয়া সুখে জীবন যাপন করিত।

স্থল-বাণিজ্য

প্রাচীন ভারতে স্থল-বাণিজ্যের প্রধান বাহন ছিল গো-যান। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সেকালে সুগঠিত পথ ছিল না। পরবর্ত্তী কালে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রচারকগণ দেশে দেশে গমন করিতেন তখনকার দুইটি পথের অস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। সেই সময়ে বণিকেরা শ্রাবস্তীনগর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে যাত্রা করিয়া মাহিষ্যতি, উজ্জয়িনী, বিদিশা, কোশম্বী ও সাকেত হইয়া পৈঠান নগরে গমন করিত। আবার তাহারা শ্রাবস্তী হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে কপিলাবাস্তু, কুশীনগর, পাবা, হস্তিগ্রাম, বৈশালী, পাটলিপুত্র, নালন্দা হইয়া রাজগৃহে গমন করিত। এই পথে সম্ভবতঃ গয়ায়ও যাতায়াত করা হইত। তাম্রলিপ্তী হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত সমুদ্রোপকুল দিয়া একটি পথ ছিল। বারাণসীর বণিকেরা গো-যানে উজ্জয়িনী এবং বিদেহের বণিকেরা গান্ধার পর্য্যন্ত বাণিজ্য করিতে যাইত এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। পথে দস্যুভয় ছিল। দস্যুরা দলবদ্ধ হইয়া কখন কখন বণিকদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। দস্যুদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বণিকেরা দলবদ্ধ হইয়া যাত্রা করিত। এই যাত্রিদলের যিনি নেতা হইতেন তাহার উপাধি ছিল "স্বার্থবাহ"। উজ্জয়িনী, ভৃগুকচ্ছ, গান্ধার প্রভৃতি স্থানে যাইবার সময়ে বণিকদিগকে মরুভূমি অতিক্রম করিতে হইত। রিস্‌ডেভিডস্ বলেন—In crosisng the desert west of Rajputana the caravans are said to travel only in the night and to be guided by a "Land pilot" who just as one does on the ocean, kept the right route by observing the stars. রাজপুতনার পশ্চিমদিকের মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিবার সময় বণিকেরা তাহাদের শকট কেবল রাত্রিকালে চালনা করিত। তাহাদের নিযুক্ত পথ-প্রদর্শক (Land-pilot) পথ

দেখাইয়া লইয়া যাইতেন। নক্ষত্র দেখিয়া সমুদ্রমধ্যে যেমন করিয়া পথ নির্ণয় করা হয়, এই ক্ষেত্রেও সেইরূপ করা হইত।

বণিকেরা যখন দীর্ঘ বনপথ অতিক্রম করিত তখনও তাহারা রক্ষী নিযুক্ত করিয়া আত্মরক্ষা করিত।

অর্ণবপোত ও সমুদ্র-বাণিজ্য

সুপ্পারক, সমুদ্রবাণিজ্য, বাবেরু, মহাজন প্রভৃতি বহু জাতকে সমুদ্র-বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যগ্রন্থে যে সকল সামুদ্রিক জলযানের বর্ণনা পাওয়া যায় সেইগুলি খুব বৃহৎ আয়তনের ছিল বলিয়া মনে হয়। যে অর্ণবপোত আরোহণ করিয়া যুবরাজ সিংহবাহু সিংহলদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন সেই পোতে যুবরাজ ব্যতীত পাঁচশত বণিক্‌ও ছিল। যে জলযানে পাণ্ড্য রাজকুমারী সিংহলে গমন করিয়াছিলেন সেই যানে আঠার শত রাজকর্ম্মচারী, পঁচাত্তর জন ভৃত্য, বহুসংখ্যক ক্রীতদাস এবং শত শত কুমারী কন্যা ছিলেন।

ভারতীয়দের নৌ-বাণিজ্যের দক্ষতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে বহু বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। বাহুল্যভয়ে সেগুলির উল্লেখ করা হইল না। কলিকাতানগরস্থ সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে 'যুক্তিকল্পতরু' নামে একখানি হস্তলিপি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ঐ গ্রন্থে জল-যান-নির্ম্মাণ-শিল্প বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

জলযানের আকৃতিগত পার্থক্যের হিসাবে "যুক্তি-কল্পতরু" যানগুলিকে মোটামুটি "সামান্য" ও "বিশেষ" এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। "সামান্য" যানগুলি সাধারণতঃ নদীগর্ভে বিচরণ করিত। "বিশেষ" যানগুলি সমুদ্রযাত্রার জন্য ব্যবহৃত হইত। 'সামান্য' যানগুলি দশ প্রকারের যথা—ক্ষুদ্রা, মধ্যমা, ভীমা, চপলা, পটলা, ভয়া, দীর্ঘা, পত্রপুটা, গর্ভরা ও মন্থরা। এই যানগুলির মধ্যে

ক্ষুদ্রা দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ২১, ৫১/৪, ৫১/৪ হস্ত। পরবর্ত্তী যানগুলির আয়তন ক্রমশঃ অধিক। মন্থরা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই শ্রেণীর যানের দৈর্ঘ্য ২১০, প্রস্থ ১০৫, উচ্চতা ১০৫ হস্ত। দশপ্রকার যানের মধ্যে ভীমা, ভয়া ও গর্ভরাকে 'অশুভপ্রদা' বলা হইয়াছে। বোধ করি নদীবক্ষে যাতায়াতের পক্ষে এই যানগুলি অনুকূল ছিল না।

'বিশেষ' শ্রেণীর যানগুলিকে প্রধানতঃ 'দীর্ঘা' ও 'উন্নতা' এই দুই-ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ 'দীর্ঘা' দৈর্ঘ্যের এবং 'উন্নতা' উচ্চতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

দীর্ঘাজাতীয় দশ প্রকার জলযানের উল্লেখ আছে যথা—দীর্ঘিকা, তরণী, লীলা, মত্বরা, গামিনী, তরি, জঙ্ঘলা, প্লাবিনী, ধারিণী ও বেগিনী। বেগিনী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার দৈর্ঘ্য ২৫২, প্রস্থ ৩১১/২, উচ্চতা ২৫১/২ হাত। দীর্ঘাজাতীয়া যানের মধ্যে লীলা, গামিনী ও প্লাবিনী 'অশুভপ্রদা' বলিয়া কথিত হইয়াছে।

'উন্নতা' জাতীয় পাঁচ প্রকার জলযানের উল্লেখ আছে। ঊর্দ্ধা, অনূর্দ্ধা, স্বর্ণমুখী, গর্ভিণী ও মন্থরা। উক্ত পাঁচ প্রকার যানের মধ্যে অনূর্দ্ধা, গর্ভিণী ও মন্থরাকে 'নিন্দিতা' এবং ঊর্দ্ধাকে 'শুভদা' বলা হইয়াছে।

যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে জলযানের চিত্রণ সম্বন্ধে বহু কথা আছে। যানের কক্ষগুলি কনক, রজত ও তাম্র এই ধাতুত্রয় বা ইহাদের মিশ্রদ্রব্য দ্বারা সুসজ্জিত করা হইত। চতুঃশৃঙ্গ বা চারি মাস্তুলের যান শাদা-বর্ণে, ত্রিশৃঙ্গ যান রক্তবর্ণে, দ্বিশৃঙ্গ যান পীতবর্ণে এবং একশৃঙ্গ যান নীলবর্ণে চিত্রিত করিবার নিয়ম ছিল। যানের মুখ বা গলুই সিংহ, মহিষ, নাগ, হস্তী, ব্যাঘ্র, পক্ষী, ভেক বা মানুষের মুখের মত করিয়া নির্ম্মাণ করা হইত। যানের মুখ সুবর্ণ বা মুক্তাহারে সুসজ্জিত করা ভদ্র বলিয়া বিবেচিত হইত।

যে যানগুলির কুটরী বা কক্ষ খুব বৃহৎ সেইগুলিকে 'সর্ব্বমন্দিরা' বলা হইত। এই শ্রেণীর যান রাজধন, অশ্ব ও রমণী বহনের প্রশস্ত

যান বলিয়া বিবেচিত হইত। আর এক শ্রেণীর যানকে 'মধ্যমন্দিরা' নাম দেওয়া হইয়াছে। এই যানগুলি বর্ষা ঋতুতে রাজাদের বিলাস-যাত্রার জন্য ব্যবহৃত হইত। যে যানগুলির কুটরী গলুইর দিকে থাকিত সেইগুলির নাম ছিল "অগ্রমন্দিরা"। এই যানগুলি দূরপ্রবাস যাত্রায় এবং রণে উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইত।

অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় সভ্যতা যবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতের বিবিধ শিল্প তথায় উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তথাকার বোরোবদর মন্দিরগাত্রে প্রস্তর-খোদিত জাহাজ ও নৌ-যাত্রীর ছবি দেখা যায়। খৃষ্টের প্রথম শতকে ভারতীয়েরা কেমন করিয়া যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন উক্ত চিত্র তাহাই স্মরণ করাইয়া দেয়। খৃষ্টের পঞ্চম শতকে পরিব্রাজক ফাহিয়েন একযানে সিংহল হইতে তিনমাসে যবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর কোন কোন অন্ধ্রমুদ্রার উপরে দ্বি-শৃঙ্গ পোত অঙ্কিত আছে। ঐ পোতগুলি বৃহদাকারের ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ ঐ মুদ্রাগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন—"কতকগুলি মুদ্রার উপর পোত অঙ্কিত রহিয়াছে, ইহা হইতে মনে হয় জ্ঞানশ্রীর (১৮৪—২১৩ খৃষ্টাব্দ) প্রভুত্ব যেমন স্থলভাগে তেমন জলভাগেও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

সিওয়েল সাহেবের মতে ঐ সময়ে জল স্থল উভয় পথেই পশ্চিম এশিয়া, গ্রীস, রোম, মিশর, চীন ও অপর বহু প্রাচ্য রাজ্যের বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল।

ইহা একরূপ নিঃসন্দেহ যে ভারতীয় বণিকগণ সেই অতীত কালে তাহাদের পণ্যপূর্ণ জলযান লইয়া দ্বীপান্তরে গমন করিত। জলযানগুলি নদী বা সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দর (পট্টন) হইতে যাত্রা করিত। বারাণসী, চম্পা, ভৃগুকচ্ছ প্রভৃতি পট্টন হইতে বাণিজ্যপোত বিদেশে যাত্রা করিত। জলযানগুলি চালনা করিবার জন্য নিয়ামক (pilot) নিযুক্ত হইল। নিয়ামকগণ দিবা ভাগে সূর্য্য এবং রাত্রিকালে নক্ষত্র দেখিয়া দিক্ নির্ণয় করিত। কদাচ প্রতিকূল

বায়ুযোগে পোতগুলি সমুদ্রতীর হইতে দূরে নীত হইলে নিয়ামক-গণ পোষা কাক ছাড়িয়া দিয়া কোন্ দিকে স্থল রহিয়াছে তাহা জানিয়া লইত।

অজন্তার ২নং গুহায় নৌকা ও অর্ণব পোতের চিত্র পাওয়া গিয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে প্রবাসী পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে বলিয়াছেন —"এই যুগে ভারতবর্ষের নৌ-শক্তিও বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। তাৎকালিক শিল্পকলাতেও তাহার আভাস পাওয়া যায়। তখন শতশত রণতরী রাজকীয় নৌ-বাহিনীর উৎকর্ষের পরিচয় দিত। এই নৌ-বাহিনীর সাহায্যে দ্বিতীয় পুলকেশী পূর্ব্ব সমুদ্রের অধীশ্বরী পুরী নগরী জয় করেন। এই সময়েই গুজরাট বন্দর হইতে দলে দলে সাহসী ব্যক্তি ভারতমহাসমুদ্রের বীচিবিক্ষুব্ধ নীলাম্বুরাশি ভেদ করিয়া এক অভিনব কর্ম্মক্ষেত্র আবিষ্কারের আশায় উৎসাহান্বিত হৃদয়ে অর্ণবপোত যাত্রা করেন। তারপর যবদ্বীপের কূলে উপনীত হইয়া সেই স্থানে উপনিবেশ সংগঠন কার্য্যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন।

সুতরাং এই প্রবন্ধে অজন্তার নৌ-চিত্রসমূহের যে দুই খানি চিত্র সন্নিবেশিত হইল ঐ চিত্রদ্বয় ঐ যুগের ভারতবাসীর সমুদ্রযাত্রা ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিচায়ক তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। গ্রিফিথস্ সাহেবের মতেও এইগুলি প্রাচীন বাণিজ্যের সাক্ষ্য প্রদান করে।

They are a vivid testimony to ancient foreign trade of India অর্থাৎ এই সকল প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন।

ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রকে অতি উপাদেয় তথ্যপূর্ণ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। কৌটিল্য বা চাণক্য মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন। তৎপ্রণীত অর্থশাস্ত্রে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতকের রাজ্যশাসনপ্রণালী,

ধর্ম্ম, আচারব্যবহার ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে বহু তথ্য জানিতে পারা যায়। কৌটিল্যপ্রণীত এই গ্রন্থখানি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মহীশূর দরবারের আনুকূল্যে মুদ্রিত হইয়াছে। তাঞ্জোর জিলার এক পণ্ডিত এই গ্রন্থের হস্তলিপি ১৯০৫ অব্দে মহীশূর গভর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।

অর্থশাস্ত্রপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় তখন ভারতবর্ষে রাজতন্ত্রশাসন-প্রণালীই প্রচলিত ছিল। কৌটিল্যের মতে রাজা দিন ও রাত্রি উভয়কেই আটভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগে কোন-না-কোন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন। দিবাভাগে তিনি যথাক্রমে (১) প্রহরী নিয়োগ ও হিসাব পরীক্ষা, (২) নগর ও গ্রামবাসীদের আবেদন শ্রবণ, (৩) স্নান-আহার-অধ্যয়ন, (৪) রাজস্বগ্রহণ, (৫) পত্রলিখন ও গুপ্তচর-দের ব্যক্তব্য শ্রবণ, (৬) বিনোদন, (৭) হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক প্রভৃতি পরিদর্শন, (৮) প্রধান সেনাপতির সহিত যুদ্ধকৌশল আলোচনা করিবেন।

রাত্রিকালে তিনি যথাক্রমে (১) গপ্তচরদের বক্তব্য শ্রবণ (২) স্নান, ভোজন ও অধ্যয়ন (৩) (৪) (৫) বিশ্রামসম্ভোগ (৬) নিদ্রাভঙ্গে তিনি শাস্ত্রানুশাসন ও দিবসের কর্ত্তব্য অনুধ্যান (৭) শাসনবিধি আলোচনা ও গুপ্তচর প্রেরণ (৮) গুরুজনদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক রাজসভায় গমন করিবেন।

যাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে কর্ম্মপটুতার পরিচয় প্রদান করেন এমন ক্ষমতাশালী সুপণ্ডিত কতিপয় ব্যক্তিকে রাজা তাঁহার উপদেষ্টা মন্ত্রী ও অমাত্য নিয়োগ করিতেন। মন্ত্রী ও অমাত্য ব্যতীত আরও অনেক উচ্চ রাজকর্ম্মচারী থাকিতেন। তাহাদের এক এক জনের উপর বিশেষ বিশেষ কার্য্যের ভার থাকিত। যিনি রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হইতেন তাঁহার উপাধি ছিল "সমাহর্ত্তা"। রাজকরের হিসাব লিখিয়া যিনি উহা রাজকোষে জমা দিতেন তিনি "সন্নিধাতা" নামে উক্ত হইতেন।

পুরোহিত অন্যতম প্রসিদ্ধ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। বিচার

পর্য্যবেক্ষণ ও যাগযজ্ঞের ব্যবস্থা তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। যিনি সচ্চরিত্র, উচ্চবংশজাত, বেদ-বেদাঙ্গে সুপণ্ডিত, রাষ্ট্রনীতিবিশারদ, যিনি অথর্ব্ব বেদ-বিহিত ক্রিয়াকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া রাজার বিপদ্ নিবারণে সমর্থ এমন ব্যক্তিই প্রধান পুরোহিত নিযুক্ত হইতেন।

এই সকল উচ্চ কর্ম্মচারী ব্যতীত আরও কতিপয় "অধ্যক্ষ" ছিলেন। ইহাদের কেহ খনির তত্ত্বাবধান, কেহ শিল্প-বাণিজ্যের তদন্ত, কেহ জিনিষের মূল্য নির্দ্ধারণ, কেহ গো-শালার তত্ত্বাবধান কেহ হস্তীশালা কেহ বা অশ্বশালার তত্ত্বাবধান, কেহ বা শুল্ক আদায় করিতেন।

চোর ডাকাত ও দুর্ব্বৃত্তদিগকে দমন করিবার জন্য রাজা দেশের সর্ব্বাংশে নানাশ্রেণীর গুপ্তচর নিযুক্ত করিতেন। কৃষক, ব্যবসায়ী ও অপর নানা সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক গুপ্তচর নিযুক্ত হইত। শান্তিরক্ষক কর্ম্মচারীরা চোর ডাকাতদিগকে ধরিতে না পারিলে অপহৃত অর্থাদির জন্য তাহারা দায়ী হইত। এই প্রকারে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইত রাজা রাজকোষ হইতে তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিতেন।

সেকালে রাজারা কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। প্রজাগণ যাহাতে উৎকৃষ্ট বীজ ও কৃষি-যন্ত্রপাতি প্রাপ্ত হয় সরকার হইতে তাহার ব্যবস্থা করা হইত। প্রজাদের কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য সরকার হইতে খাল কাটিয়া দিবার ব্যবস্থাও ছিল। যাহারা এই প্রকার সহায়তা প্রাপ্ত হইত তাহাদিগকে উৎপন্ন শস্যের একাংশ জলকর দিতে হইত। কৃষি-বিভাগের অধ্যক্ষ সরকারী খাসের জমি চাষ করিবার জন্য ক্রীতদাস, শ্রমিক কিংবা কয়েদীদিগকে নিযুক্ত করিতেন। ইহাদিগকে ভূমিকর্ষণের জন্য বলদ, লাঙ্গল এবং অপর সকল যন্ত্র দেওয়া হইত। তখন বর্ষাঋতুর প্রারম্ভে কৃষকগণ শালি, ব্রীহি, তিল, প্রিয়ঙ্গু প্রভৃতি শস্য বপন করিত। কৃষি বিভাগের অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে কেবল শস্য নহে, নানাপ্রকার পুষ্প, ফল, উদ্ভিজ্জ,

মূল, তূলা এবং ভেষজরূপে ব্যবহৃত ছোট ছোট গাছ, লতা, গুল্ম প্রভৃতিরও চাষ হইত।

রাজকীয় খাস জমির উৎপন্ন, প্রজাদের প্রদত্ত রাজস্ব, বাণিজ্য-শুল্ক এবং খনির আয় এই সকলের সমষ্টিই রাজার মোট আয় ছিল। প্রজাদের জমিতে যাহা উৎপন্ন হইত, রাজা উহার চতুর্থ কিম্বা ষষ্ঠাংশ রাজকর লইতেন। রাজ্যের সমস্ত খনি রাজার সম্পত্তি ছিল। লবণের ব্যবসায়ও তখন রাজার হস্তে ছিল। নাবালক, বিধবা ও রোগার্ত্তেরা রাজার প্রতিপাল্য ছিল।

তখন রাজকীয় অনুমতিপ্রাপ্ত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি মোদক, প্রসন্ন, আসব, অরিষ্ট, মধু প্রভৃতি নামধেয় মদ্য প্রস্তুত করিত। যাহারা চরিত্রবান্ এমন লোকের নিকট সামান্য পরিমাণে মদ্য বিক্রয় করা হইত। কোন ব্যক্তি গোপনে মদ্য প্রস্তুত করিলে তাহাকে ছয় শত মুদ্রা (পাণ) জরিমানা দিতে হইত।

সেকালে সমুদ্র, নদী ও হ্রদে যে সকল যান যাতায়াত করিত রাজার পোতাধ্যক্ষ কর্ম্মচারী সেই সমস্তের তত্ত্বাবধান করিতেন। যে সকল গ্রাম সমুদ্র, হ্রদ কিংবা নদীর তীরবর্ত্তী ছিল সেই সকল গ্রামবাসীদিগকে এক প্রকার শুল্ক দিতে হইত। ধীবরগণ জাল বাহিয়া যে মৎস্য পাইত উহার ষষ্ঠাংশ শুল্ক দিত। প্রত্যেক বন্দরে ব্যবসায়ীদের জন্য নির্দ্ধারিত শুল্ক ছিল, বণিকদিগকে ঐ শুল্ক দিতে হইত। রাজকীয় যানে যে-সকল যাত্রী যাতায়াত করিত তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট মাশুল দিতে হইত। যাহারা রাজকীয় নৌকায় শঙ্খ ও মুক্তা উত্তোলন করিত তাহাদিগকে সেই নৌকার ভাড়া দিতে হইত। যে সকল বণিকের বাণিজ্য দ্রব্য জলপথে নষ্ট হইত তাহাদিগের নিকট শুল্ক আদায় করা হইত না, অথবা অর্দ্ধ শুল্ক লওয়া হইত। যে সকল যান পোতাশ্রয়ে দাঁড়াইত ঐ সকল যানের মালিকদিগের নিকট শুল্ক দাবী করা হইত।

সেকালে পল্লীগ্রামে পঞ্চায়েৎ শাসন প্রচলিত ছিল। গ্রামের মণ্ডলেরা শান্তিরক্ষা, বিচার ও সাধারণ সম্পত্তি রক্ষা করিতেন।

গ্রামের প্রধান কর্ম্মচারী 'গ্রামিক' গ্রামবাসীদের দ্বারা বোধ হয় নির্ব্বাচিত হইতেন। কয়েকটি গ্রামের উপর "গাপ" নামে এক কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি গ্রাম হইতে রাজস্ব আদায় করিতেন এবং মানুষ ও পশু প্রভৃতির সংখ্যামূলক হিসাব রাখিতেন।

তখন "নাগরিক" নামক এক কর্ম্মচারী নগর শাসন করিতেন। নগরের যাবতীয় বিধিব্যবস্থা তাঁহার হাতে ছিল।

দশম অধ্যায়

বৌদ্ধ শিল্প

বৌদ্ধশিল্প বৌদ্ধধর্ম্মের উদার উৎস হইতে উৎসারিত হইয়াছিল। এই শিল্পের যে নিদর্শন এক্ষণে আমরা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতেছি উহা হইতে আমরা নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারি যে, ভারত-ব্যাপী এক উদার ধর্ম্মের সমবায়ে এক সময়ে এই দেশে স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্পের অসামান্য অভ্যুত্থান হইয়াছিল। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে চিত্রশিল্পের চর্চা ছিল। তখন শিল্পের কতদূর উন্নতি হইয়াছিল তাহা প্রত্নতত্ত্ববিৎদিগের আলোচ্য। অজন্তা, সাঁচি, ভারহুত, করালী, নালন্দা, সারনাথ, গয়া প্রভৃতি নানাস্থলে এক্ষণে বৌদ্ধশিল্পের যে সকল ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইতেছে সেই সকলের মধ্যে বৌদ্ধশিল্পের আশ্চর্য্য উন্নতির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আধুনিক যুগের সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পিগণ বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। কত শিল্পী তাঁহাদের আজীবনের সাধনার দ্বারা এক একটি মন্দির বা গুহা চিত্রশোভিত করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়।

ভারত-শিল্প যাঁহারা অল্পাধিক আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, এই দেশের শিল্পীরা কোন বস্তু বা ব্যক্তির আকৃতির হীন অনুকরণকে আপনাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন নাই। বিশ্বপ্রকৃতি তাহার অঞ্চলতলে, যে সুষমা প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, শিল্পী রেখাপাতে বা বর্ণভঙ্গে তাহাই দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপন করিয়া থাকেন। রূপের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য ভারতশিল্পের প্রধান লক্ষ্য নহে, উপলক্ষ্য মাত্র। বাহিরের রূপকে ভিতরের ভাবের সহিত মিলাইয়া এবং ভিতরের ভাবকে বাহিরের রূপে ফুটাইয়া তোলাই ভারতশিল্পের

বিশেষত্ব। মানবজীবনের সুখদুঃখময় বিচিত্র ঘটনার মধ্যে আনন্দময় দেবতার যে অনন্তলীলা হইয়া থাকে, কবি তাহা কাব্যে, শিল্পী তাহা শিল্পে ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কবির ছন্দোময়ী বাণী যেমন শ্রোতার হৃদয় ভাবরসে পূর্ণ করিয়া দেয়, শিল্পীর রেখা ও বর্ণময় চিত্রও তেমন দর্শকের চিত্ত স্পন্দিত করিয়া থাকে। মহাকবির রচনার ন্যায় শ্রেষ্ঠ শিল্পীর শিল্প আমাদের আত্মা সংস্কৃত ও অলঙ্কৃত করে, কেবল তাহা নহে ইহার প্রভাবে আত্মা ছন্দোময় হইয়া থাকে। এই শিল্প সীমার মন্দিরে অসীমের আনন্দ ধ্বনিত করিয়া তোলে। এই আধ্যাত্মিকতাই ভারতীয় কলাবিদ্যার বিশিষ্টতা। বঙ্গের ঋষিকল্প সুধী শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"ইহসর্ব্বস্ব যে চারুকলা তাহা ছাড়িয়া আমরা চাহিতেছি সেই কলা যাহা ভগবানের সহিত আমাদিগকে পরিচিত করাইয়া দেয়। মানুষের অধোমুখী প্রবৃত্তি সমূহের মূর্ত্তি যে কলা ফুটাইয়া তুলে তাহা হইতে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিতে চাহিতেছি উচ্চতর, মহত্তর, শুদ্ধতর প্রেরণার চিত্র।

চারুকলার উদ্দেশ্য রস সৃষ্টি। ভগবৎ উপলব্ধিতে এক রস, বিষয় সম্ভোগে আর এক রস। শিল্পী এই দুই বিষয়ের যে কোনটি লইয়া রসপূর্ণ সৃষ্টি করিতে পারেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠরস, রসের পূর্ণতা যদি কিছু দেখাইতে চাহেন তাহা হইলে শিল্পী যেন ভগবানকেই বাক্যে, শব্দে, চিত্রপটে, প্রস্তরফলকে ফুটাইয়া তুলেন।

আর্টের মূলকথা হইতেছে চিরন্তন অনন্ত সত্য। এই সত্য হইতেছে বৃহৎ—সর্ব্বত্র বিস্তৃত। চক্ষুর কাছে যাহা সুন্দর বা অসুন্দর, সংস্কারের কাছে যাহা প্রিয় বা অপ্রিয়, বুদ্ধির কাছে যাহা ভাল বা মন্দ সেই সকলের মধ্যেই এক নিগূঢ় সত্য রহিয়াছে। এই সত্যই নিত্য, ইহাই রসপূর্ণ, এই জিনিষটাই শিল্পী দেখাইতে চাহেন। করুণার অবতার ভগবান্ তথাগতকে শিল্পী আঁকিয়া দেখাইতে পারেন। তাই বলিয়া রুদ্র-আত্মা নাদিরসাহের প্রতিমূর্ত্তিকে শিল্প-জগৎ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে কেন?

আর্টের দিক দিয়া বিচার করিলে বটতলার উপন্যাস যেমন কুৎসিত রবিবর্ম্মার দেবদেবী মূর্ত্তিও তেমন কুৎসিৎ। শুধু শরীর যেখানে, শরীরের পশ্চাতে গভীরতর কোনো সত্যের মধ্যে শরীরের অর্থটি যেখানে পাই না, সাধুর অতীন্দ্রিয়পরতা, নীতিবাদীর শ্লীলতাবোধের দিক হইতেও উহা যেমন হেয়, শিল্পীর সৌন্দর্য্যবোধের দিক হইতেও তেমনি।

উলঙ্গ রমণীর আত্মার কথাটিকে ব্যক্ত করিয়া যে শিল্পী উলঙ্গ রমণীর চিত্র আঁকিয়াছেন, তিনি উলঙ্গ রমণীকে দুষ্ট-দৃষ্টি দিয়া দেখেন নাই, সাধুর দৃষ্টি দিয়াও দেখেন নাই, তিনি দেখিয়াছেন ঋষির দৃষ্টি দিয়া। তিনি উলঙ্গ করিয়াছেন ভগবৎ সত্যকে। উলঙ্গ নারীর চিত্র আমাদিগকে বিচলিত করিতে পারে। কিন্তু সেইজন্য উহাতে যে সত্য, যে সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহার উপভোগ হইতে বিরত থাকিব কেন? ইন্দ্রিয়কে দমন করিতে যাইয়া ইন্দ্রিয়ের সত্য ভোগকে নির্ব্বাসিত করিব কেন? ইন্দ্রিয়ের যে বাহ্য বিক্ষোভ তাহার ভয়ে ইন্দ্রিয়ের দেবতাকে অস্বীকার করা সত্যানুভূতিরই অন্তরায়।

সাধনার দিক হইতেও আর্টের যে কোনো মূল্য নাই এমন নহে। তবে শিল্পীর পথ ও সাধু বা ধার্ম্মিকের পথ এক নহে। সাধুর পথ "ইহা নয়" "ইহা নয়"। শিল্পীর কথা "ইহাই" "ইহাই"। সাধু চাহেন ইন্দ্রিয়কে দমন রাখিয়া ইহাকে দূর করিয়া শুধু অতীন্দ্রিয়ে পৌঁছিতে অথবা ইন্দ্রিয়ের কোন এক নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গী বা প্রকরণের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে। শিল্পী চাহেন ইন্দ্রিয়ের বিশ্বভূতির মধ্যেই অতীন্দ্রিয়কে বোধ করিতে। আচার নিয়মের মধ্যে সাধু ধর্ম্মজীবন গঠিত করিতে চাহেন, শিল্পীর আচার নিয়ম নাই। প্রথম হইতেই তিনি আপনাকে মুক্ত বলিয়া মানিয়া লন। এই শ্রদ্ধাটুকু সর্ব্বদার জন্য ধরিয়া রাখিতে পারিলে তিনি মুক্ত হইতে পারেন।

আর্ট হইতেছে দৃষ্টির Revelation. এই দৃষ্টি বস্তুর অন্তরতম রহস্যের সহিত সাক্ষাৎভাবে আমাদের এক সহজ পরিচয় স্থাপন করাইয়া দেয়। অনেক সময়ে অজানিত ভাবেই আর্টের সাহায্যে বস্তুর

প্রাণের সহিত আমরা মিলিত হই। এই সম্বন্ধই রসের সম্বন্ধ।

প্রকৃতপক্ষে আর্ট ও ধর্ম্মের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নাই, আত্মার সহিত পরিচিত হওয়াই যদি ধর্ম্মের লক্ষ্য আর্টেরও তবে উহাই লক্ষ্য। অধ্যাত্মদ্রষ্টা যদি আত্মাকে দেখিতে পাইয়া শরীরকে অথবা শরীরের কোন ভাগকে বাদ দিয়া না রাখেন তবে শিল্পীও স্বচ্ছন্দে শরীর মধ্যে সকলরূপে আত্মার মহিমাকে বর্ণে, শব্দে, বাক্যে, প্রস্তর-ফলকে মূর্ত্তিমান করিয়া পরম আধ্যাত্মিকতারই কার্য্য করিবেন।"

হ্যাভেল সাহেব তৎপ্রণীত Indian Sculpture and Painting নামক গ্রন্থে ভারতশিল্পের এই আধ্যাত্মিকতাই বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

Greek and Italian art would bring the gods to earth and make them the most beautiful of men; Indian art raises men up to heaven and makes them as gods.

গ্রীক ও ইটালীয় শিল্প দেবতাদিগকে নরত্বদান করিয়া পরম-সুন্দর মানুষরূপে চিত্রিত করিয়া থাকে; কিন্তু ভারত-শিল্প মানুষকে দেবত্ব দান করিয়া দেবতারূপে চিত্রিত করে।

যে বীর্য্য আধ্যাত্মিকতার মধ্য হইতে প্রস্ফূর্ত হয় না, সাধনা যে রূপকে পবিত্রতায় অভিষিক্ত করে না সেই বীর্য্য, সেই সৌন্দর্য্য ভারতশিল্পীর লক্ষ্য হইতে পারে না।

হ্যাভেল সাহেব লিখিয়াছেন ঃ—

The ideal of manly beauty he set before himself was not represented by a Rajput warrior but by a divine Buddha, Krisna or Siva. His ideal of female beauty was not seen in the fairest of Indian beauty but in Parbati.

ভারতশিল্পী তাহার মানসনেত্রে শৌর্য্যের যে আদর্শ রক্ষা করিতেন সে আদর্শ রাজপুত যোদ্ধা নহে, ঐ আদর্শ ভগবান্ বুদ্ধ,

কৃষ্ণ কিংবা শিব। ভারতশিল্পী এই দেশের পরমাসুন্দরী নারীকে আদর্শ নারী মনে করেন নাই, তাহার চক্ষে পার্ব্বতীই নারী-সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ।

ভারতশিল্পের এই মহাযুগের বর্ণনা করিয়া হ্যাভেল সাহেব লিখিয়াছেন—

In the great epoch of Indian religious art which we are reviewing, art, religion and education had no existence apart from each other as they have is this age of specialisation and materialism.

অর্থাৎ বর্ত্তমান স্বাতন্ত্র্য ও বাহ্যসম্পদের যুগে শিল্প, ধর্ম্ম ও শিক্ষা সমস্তই যেমন স্বতন্ত্র, ভারতের সেই ধর্ম্মশিল্পের মহাযুগে তেমন ছিল না। তখন ইহাদের প্রত্যেকটি পরস্পরের সহিত অন্বিত ছিল।

তখন কে শিল্পচর্চা করিতেন তৎপ্রসঙ্গে হ্যাভেল সাহেব বলিয়াছেন—

The Buddhist monks were often themselves practising artists. They used the arts, not for vulgar amusement and distraction, but as instruments for the spiritual and intellectual improvement of the people.

বৌদ্ধভিক্ষুরাই অনেক সময়ে শিল্পচর্চা করিতেন। তাহারা শিল্পকলাকে অশ্লীল আমোদ ও উন্মাদনার জন্য ব্যবহার না করিয়া উহাকে লোকের আধ্যাত্ম ও মানসিক উন্নতি বিধানের উপায় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

শিল্পী প্রত্যেক চিত্রে একটি বিশেষ ভাবকে মূর্ত্তিদান করিতে চেষ্টা করেন। ভারতশিল্পের বিশেষত্ব এই যে, অস্মদ্দেশীয় শিল্পী চিত্রের সকল অংশের পূর্ণতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া চিত্রের মূল বিশেষ ভাবটিকেই বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিতে চান। অপ্রধান

অংশগুলি তিনি উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এই বাহুল্যবর্জ্জিত সরলতা ভারত-শিল্পের প্রাণ, অনাবশ্যক রেখাঙ্কনে, অতিরিক্ত বর্ণ-লেপনে ভারতশিল্পী তাহার চিত্র জটিল করিয়া তুলেন না। বিদেশীয় চিত্রশিল্পের বর্ণচ্ছটা যাহাদের চক্ষু বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহারা ভারতীয় শিল্পের ভাবগ্রহণে অসমর্থ হইয়া এই শিল্পের নিন্দা করিয়া থাকেন।

খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে সুসভ্য গ্রীকগণ ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ঐ সুদূর অতীতকালে ভারতবর্ষে দুই সুসভ্য জাতির সম্মিলন হইয়াছিল। ইহার ফলে এই দুই সুসভ্য জাতি পরস্পরের জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া উপকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু সুপণ্ডিত ঐতিহাসিকগণ বলেন, শিল্পবিদ্যার জন্য ভারতীয় হিন্দুরা গ্রীকদের নিকট ঋণী নহেন। গ্রীকদের আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধগণ তাহাদের শিল্পবিদ্যায় উন্নতি-লাভ করিয়া উহার উপরে আপনাদের নিজস্ব প্রতিভার ছাপ অঙ্কন করিয়া দিয়াছিলেন। গান্ধার ও পাঞ্জাবে স্তম্ভশিল্পে গ্রীক শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের অপর কোনস্থলে গ্রীকশিল্পের নিদর্শন দৃষ্ট হয় না। গ্রীকশিল্পীর শিক্ষালয়ে ভারতবর্ষ যদি শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিতেন তাহা হইলে এইরূপ হইতে পারিত না।

পাঞ্জাব ব্যতীত ভারতের অপর কোন স্থলে গ্রীক-ভাস্কর্য্যের নিদর্শন দৃষ্ট হয় না। ডাক্তার ফার্গুসন ভারহুত স্তূপের বেষ্টনীর ভাস্কর্য্য দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া এই মন্তব্য করিয়াছেন,—"এই স্থলে যে ভাস্কর্য্যবিদ্যার পরিচয় রহিয়াছে তাহা যে ভারতীয় ইহা একান্ত দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে মিশরশিল্পের বিন্দুমাত্র প্রভাব লক্ষিত হয় না। এই শিল্প জটিলতাবর্জ্জিত। বাবিলন বা আসিরিয়ার শিল্পপ্রভাব এতন্মধ্যে দৃষ্ট হয় না। এখানে স্তম্ভের মস্তকদেশে যে সকল আলঙ্কারিক কার্য্য আছে তাহার সহিত গ্রীকশিল্পের সাদৃশ্য নাই। এখানে যে শিল্পবিদ্যার পরিচয় রহিয়াছে

তাহা সর্ব্বতোভাবে ভারতীয়দের পরিকল্পিত এবং ভারতীয় শিল্পী-দের দ্বারা কৃত। চিত্রকলা. স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের জন্য ভারতবর্ষ বিদেশীর নিকট ঋণী নহেন; বিদেশীয় শিল্পের যেরূপ নগণ্য নিদর্শন ভারতে দৃষ্ট হয়, ভারতশিল্পের প্রভাব এশিয়া ও ইয়ুরোপ-খণ্ডের নানাদেশে তদপেক্ষা অধিকতর সুস্পষ্টরূপে পতিত হইয়াছে।”

ভাবপরিকল্পনা বৌদ্ধশিল্পের প্রাণ। বৌদ্ধগুহার চিত্রাবলীর মধ্যে ভাবপ্রধান ভারতশিল্পের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সেই প্রাচীনকালের শিল্পীরা গুহাভ্যন্তরে যে সকল নেত্রতৃপ্তিকর কারুকার্য্য রচনা করিয়াছেন সেই সকলের মধ্যে তাহাদের অসামান্য সহিষ্ণুতা ও শিল্পকুশলতা লক্ষ্য করিয়া দর্শকগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া থাকেন। ভারতশিল্পের অন্যতম পীঠস্থান অজন্তার চিত্রশোভাদর্শনে আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া শিল্পানুরাগিণী, শ্রীমতী হেরিংহাম বলিয়াছেন,—“এই প্রাচীন প্রাচীর গাত্রাঙ্কিত চিত্রে তুলিকাপাতের যে অকুণ্ঠ ও অনায়াস ভাব প্রকটিত হইয়াছে সহস্রবৎসর পরবর্ত্তী মোগল শিল্পকলায়ও তাহা দৃষ্ট হয় না। ইহা সেই সময়কার ইয়ুরোপীয় ও চীনদেশীয় চিত্রশিল্প অপেক্ষা উন্নত। চিত্র পরিকল্পনার বিরাটতা ও উদারতার নিমিত্ত অজন্তা পৃথিবীর শিল্প ইতিহাসে অতি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। বোধ হয় প্রাচীন ইটালীর পুনরুজ্জীবিত শিল্পকলাই এই গৌরবের একমাত্র তুল্য অধিকারী।”

ভারতশিল্পের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ, প্রভৃতির তথ্য নিহিত আছে। প্রাচীন ভারতের শিল্প সাধনার মনীষী সাধকগণ চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে রেখাক্ষরে তদানীন্তন ধর্ম্ম ও সমাজ-চিত্র অংকন করিয়া রাখিয়াছেন। রেখাঙ্কনে তাঁহারা যে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তেমন নৈপুণ্য আর কোন দেশের শিল্পী প্রদর্শন করিতে পারেন না। ভিন্‌সেণ্টস্মিথ গান্ধার-শিল্পকে ভারতশিল্পের জনক বলিয়াছেন। তাঁহার এই উক্তি একান্ত অশ্রদ্ধেয়। গান্ধারশিল্পে তপস্বী বুদ্ধের যে জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে উহা দেখিয়া কোন দর্শকের মনে শ্রদ্ধা ও প্রীতির উদ্রেক হইতে পারে না। ভারতশিল্পী পুরুষ-

শ্রেষ্ঠ বুদ্ধের যে মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন সেই মূর্ত্তির দিব্য সৌন্দর্য্য অনুপম। তাঁহার ললাট দীপ্ত, লোচনদ্বয় স্নিগ্ধ, বর্ণ গৌরোজ্জ্বল, শরীর বীর্য্যশালী, তিনি পদ্মাসনে আসীন। কবির কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—

বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে
নিরঞ্জন আনন্দ মূরতি ;
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে স্ফুরিছে অধর পরে
করুণার সুধা হাস্যজ্যোতি।

বিক্রমপুরে, যবদ্বীপে, সিংহলে এবং অপর নানাদেশে অবলোকিতেশ্বরের যে মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে ভারতীয় ভাস্কর ব্যতীত অপর কোন দেশের ভাস্কর তেমন মূর্ত্তি খোদিত করিতে পারেন না। বুদ্ধ পদ্মাসনে আসীন, তাঁহার উষ্ণীষে এক ক্ষুদ্র ধ্যানী-বুদ্ধমূর্ত্তি। মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করেন যে, পূর্ব্বে এক আদি বুদ্ধ ছিলেন, তাঁহার বহু হইবার বাসনা হইল, সেই বাসনার নাম প্রজ্ঞা—আদি বুদ্ধ ও প্রজ্ঞা একযোগে কয়টি ধ্যানী-বুদ্ধের সৃষ্টি করিলেন—সেই সমস্ত সৃষ্টির সহিত নিগূঢ়ভাবে তাহারা সংযুক্ত। অবলোকিতেশ্বরের উষ্ণীষস্থ ধ্যানীবুদ্ধের নাম অমিতাভ। বুদ্ধের মস্তক এক জ্যোতির্ম্মণ্ডলে আবৃত, তাঁহার বাম হস্তে ধর্ম্মচক্র মুদ্রাচিহ্ন, দক্ষিণ কর উন্মুক্ত, তাহাতে বর মুদ্রাচিহ্ন বিদ্যমান। তিনি ধ্যাননিমগ্ন, দেহের ঊর্দ্ধভাগ ঋজু, দক্ষিণ পদ এক শতদলের উপর স্থাপিত, সেই শতদল নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের চিহ্ন। এই মূর্ত্তি যে অধ্যাত্ম শান্তি প্রকাশ করিতেছে তাহা বচনাতীত।

শিল্প ভারত-শিল্পীর ধ্যানের বিষয় ছিল। ধ্যানযোগে শিল্পী যদি তাহার ধ্যেয় বিষয়ের সহিত একাত্ম হইতে না পারিতেন তাহা হইলে কদাচ এমন সত্যশিল্পের উদ্ভব হইত না।

১৩২০ সালের ফাল্গুন-সংখ্যক প্রবাসী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "বঙ্গে বুদ্ধমূর্ত্তি পূজা" শীর্ষক এক প্রবন্ধে বঙ্গীয় ভাস্কর-শিল্পীর রচিত এক বুদ্ধমূর্ত্তির বর্ণনা প্রদান

করিয়াছেন। বঙ্গীয় শিল্পীর মানস-নেত্রে ভগবান্ বুদ্ধের কি রমণীয় ধ্যান-সুন্দর মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়াছিল পাঠকগণ চিত্রদর্শনে উহার আভাস প্রাপ্ত হইবেন।

উক্ত বুদ্ধমূর্ত্তি অদ্যাপি বিক্রমপুরের অন্তর্গত নলতা গ্রামে শ্রীযুক্ত কালীকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে হিন্দুদেবতারূপে পূজিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন বাবু লিখিয়াছেন—

সাধারণের নিকট মূর্ত্তিটী "চিন্তামণি ঠাকুর" বলিয়া পরিচিত। 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধানে চিন্তামণি শব্দের অন্যান্য অর্থ ব্যতীত "বুদ্ধবিশেষ" এইরূপ এক অর্থ লিখিত আছে। কিন্তু মূর্ত্তিটী পূজিত হইতেছে অর্দ্ধ-নারীশ্বর বা হর-গৌরীর ধ্যানে।

প্রকৃত প্রস্তাবে মূর্ত্তিটী ভূমিস্পর্শ মুদ্রাস্থিত ধ্যানীবুদ্ধের মূর্ত্তি। মূর্ত্তির পাদপীঠে অতিপ্রাচীন বঙ্গাক্ষরে "লোকনাথ সাত্ম্যম্" এই লিপিটী উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই লিপিটী মূর্ত্তির নাম এবং অবস্থা-পরিজ্ঞাপক। লোকনাথ বুদ্ধদেবের নামান্তর মাত্র। সাত্মম্ শব্দটী বিশ্লেষণ দ্বারা নিম্নলিখিতরূপ অর্থপরিগ্রহ হইতে পারে। আত্মনো হিতং কর্ম্ম—আত্ম্যম্ (আত্মন্ + হিতার্থে যৎ) আত্মেন সহ বর্ত্তমানঃ ইতি সাত্ম্যম্। অর্থাৎ আত্মহিত কর্ম্মে নিয়োজিত বুদ্ধদেব। মূর্ত্তি-খানির প্রতিলিপির প্রতি দৃষ্টি করিলেই পাঠক-পাঠিকাগণ লিপির সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বিকশিত শতদলোপরি ধ্যানমগ্ন তথাগত উপবেশন করিয়াছেন। তাঁহার বদনমণ্ডলে যোগানন্দজনিত পবিত্র হাস্য উছলিয়া উঠিয়াছে। মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ জানুর উপর দিয়া ভূমিস্পর্শ করিয়াছে। ইহাই ভূমিস্পর্শ মুদ্রা নামে খ্যাত। বামহস্তখানি ক্রোড়ের উপর বিস্তৃতভাবে রহিয়াছে। ঐ হস্তের মণিবন্ধে বলয় এবং তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির অবকাশস্থলে একটী কিশলয় শোভা পাইতেছে, বক্ষঃস্থলে যজ্ঞোপবীত, বাম স্কন্ধে বিচিত্র উত্তরীয়, মস্তকে প্যাগোডার আকৃতি মনোরম মুকুট। কর্ণভূষণ স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিলম্বিত। ললাটে উন্নত টীকা। মূর্ত্তির চাল-চিত্রের উপরিভাগে বিভিন্ন মুদ্রাযুক্ত পাঁচটী ধ্যানী

বুদ্ধ। দুই পার্শ্বে দুইটী দণ্ডায়মানা নারীমূর্ত্তি। ১৪´´×৮´ ব্রাহ্মণ জাতীয় কষ্টিপাথরের ফলকে মূর্ত্তিটি তক্ষিত হইয়াছে। যে কষ্টিপাথরের ফলকে আঘাত করিলে ধাতুর ন্যায় ঠন্ ঠন্ শব্দ হয় উহাই ব্রাহ্মণ জাতীয় কষ্টিপাথর।

ভগবান্ বুদ্ধ উরুবেলায় বোধিদ্রুম মূলে যখন সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন, তখন মার বিবিধ প্রকারে প্রলোভন প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে বোধিমার্গ হইতে স্খলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, তখন মার গৌতমকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুমি যে সম্বুদ্ধ হইলে, তাহার ত কেহ সাক্ষী রহিল না। পরে কে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে? তথাগত তদুত্তরে মেদিনী স্পর্শ করিয়া পৃথিবীকে সাক্ষী করিয়াছিলেন। সেই জন্যই এই মুদ্রার নাম ভূমিস্পর্শ মুদ্রা বা সাক্ষীমুদ্রা। মহাবোধিতে এই শ্রেণীর বহুসংখ্যক মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থে এই শ্রেণীর মূর্ত্তির সাধনা বা ধ্যান আবিষ্কৃত হইয়াছে।

যে পদ্মের উপর ভগবান্ বুদ্ধ সমাসীন তাহার নাম 'বিশ্ব-পদ্ম', যে ভাবে তিনি উপবেশন করিয়াছেন তাহার নাম 'ব্রজ-পর্য্যঙ্ক-সংস্থান'।

মূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিটীতে যে অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার সহিত বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনে ব্যবহৃত অক্ষরের বিলক্ষণ সাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় উক্ত তাম্রশাসন পাল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় যুগের (খ্রীঃ দশম-একাদশ শতাব্দীর) বঙ্গলিপি বলিয়া অনুমান করেন। তাঁহার অনুমান সত্য হইলে এই মূর্ত্তিটী প্রায় সহস্র বৎসরের প্রাচীন হইবে।

উল্লিখিত বঙ্গাক্ষরযুক্ত লিপিসন্নিবিষ্ট থাকাতে মূর্ত্তিটী যে বঙ্গীয় শিলা শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন তাহা সহজেই প্রমাণিত হইতেছে। মূর্ত্তিটী এমন মসৃণ যে দেখিলে বোধ হয় ভাস্কর এইমাত্র উহার

অঙ্কন কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গের বাহিরে বুদ্ধগয়া ও সারনাথে বহুসংখ্যক মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি কিন্তু এমন কমনীয় মুখশ্রী এবং লাবণ্যে ঢলঢল মূর্ত্তি বঙ্গদেশ ভিন্ন আর কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

স্তম্ভ

বৌদ্ধশিল্পীদের শিল্পনৈপুণ্য প্রস্তরস্তম্ভ, স্তূপ, বেষ্টনী চৈত্য ও বিহারে প্রকাশ পাইয়াছে। মহামতি অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের, প্রচারকল্পে দেশের সর্ব্বাংশে প্রস্তরস্তম্ভে ধর্ম্ম ও সুনীতিমূলক বহুবাক্য খোদিত করিয়াছিলেন। এলাহাবাদ ও দিল্লীর প্রস্তরস্তম্ভের লিখিত বাক্যাবলীর পাঠোদ্ধার করিয়াছেন জেমস্ প্রিন্সেপ সাহেব। এলাহাবাদ স্তম্ভে অশোকের খোদিত লিপির তলদেশে সমুদ্রগুপ্তের খোদিত লিপিও দৃষ্ট হয়। সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার রাজগৌরব ও পূর্ব্বপুরুষগণের নাম তথায় খোদিত করাইয়া রাখিয়াছেন। এই স্তম্ভ সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের শাসনকালে একবার ভূমিসাৎ হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরও ঐ স্তম্ভে তাঁহার রাজত্বের আরম্ভসূচক বাক্যাবলী পারসিয়ান ভাষায় খোদিত করাইয়া রাখিয়াছেন। বৌদ্ধযুগের যে সকল স্তম্ভ এক্ষণে দেখা যায় সেইগুলির শিরোভাগ আলঙ্কারিক কারুকার্য্যসহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ত্রিহুতের স্তম্ভের শিরোভাগে এক সিংহমূর্ত্তি রহিয়াছে। মথুরা ও কনোজের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কাশ্য নামক স্থানের স্তম্ভ এক ভগ্ন হস্তীর উপর স্থাপিত। এই হস্তীর মূর্ত্তি এমনভাবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে যে পরিব্রাজক উয়ান চুয়াঙ্ ইহাকে সিংহ বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন।

দিল্লীর কুতবমিনারের নিকটস্থ লৌহস্তম্ভ এক বিস্ময়-সামগ্রী। এই লৌহস্তম্ভের ২২ ফিট ভূমির উপরিভাগে, ২০ ইঞ্চি ভূগর্ভে রহিয়াছে, ইহার বেষ্টন পাদদেশে ১৬ ইঞ্চি, শিরোভাগে ১২ ইঞ্চি। এই স্তম্ভের উৎকীর্ণ বাক্যাবলী পাঠ করিয়া প্রিন্সেপ সাহেব এই মত প্রকাশ

করিয়াছেন যে, ইহা খৃষ্টীয় ৪র্থ কি ৫ম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই স্তম্ভ দর্শনে ইয়ুরোপীয়দিগকে ইহা স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, প্রাচীন ভারতের শিল্পীরা যত বৃহৎ, যেমন মসৃণ লৌহদণ্ড প্রস্তুত করিতে জানিতেন উহার বহু শতাব্দী পরেও ইয়ুরোপীয়েরা এরূপ লৌহস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে জানিতেন না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চৌদ্দশত বৎসরের পরেও আজ পর্য্যন্ত এই স্তম্ভে মরিচা পড়ে নাই, উৎকীর্ণ অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেকালের ভারতীয় শিল্পী কি প্রকারে এমন গুণবিশিষ্ট লৌহস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাভিমানী বৈজ্ঞানিকদের নিকট এখনও রহস্যাবৃত হইয়া রহিয়াছে। আবু পাহাড় ও ধর নামক স্থানে প্রাপ্ত লৌহস্তম্ভও বিস্ময়ের সামগ্রী।

কেবল সৌন্দর্য্য বিকাশে নহে, ধর্ম্মের সহিত শিল্পের সংমিশ্রণে বৌদ্ধশিল্প বিশেষ গৌরব লাভ করিতেছে। ভগবান্ বুদ্ধের ধ্যান-সুন্দর মুখমণ্ডলের শান্তোজ্জ্বল শোভা, তাঁহার জন্ম, তাঁহার প্রব্রাজ্যা, তাঁহার মার বিজয়, তাঁহার ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন, তাঁহার পরিনির্ব্বাণলাভ, তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের মহত্ত্ব কাহিনী সমস্তই শিল্পীরা শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক রেখাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। কেবল তাহা নহে সে কালের জনমণ্ডলী যে সকল ঘটনা সাগ্রহে স্মরণ করিয়া রাখিয়া-ছিল, যে সকল ঘটনা লোক পরম্পরায় শতাব্দীর পর শতাব্দী রক্ষা পাইয়াছিল এমন বহু ঐতিহাসিক তথ্য শিল্পীরা চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে প্রকাশ করিয়াছেন। ধরিত্রীর জঠর হইতে যে সকল বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইতেছে তন্মধ্যে সেকালের ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে বহু বিবরণ জানা যাইতেছে। চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে মহামতি অশোক সম্বন্ধে কত আখ্যান, বিজয়সিংহের লঙ্কাদ্বীপে অবতরণ, লঙ্কার আদিম অধিবাসীদের সহিত বিজয়সিংহের যুদ্ধ, তাঁহার অভিষেক প্রভৃতি আখ্যান অঙ্কিত রহিয়াছে।

স্তূপ ও বেষ্টনী

উরুবিল্ব ভগবান্ বুদ্ধের সাধন-তীর্থ। চীনপরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্গ বলেন, সম্রাট অশোক এই স্থলে সর্ব্ব প্রথমে বিহার নির্ম্মাণ করেন। মধ্যপ্রদেশের ভারহুত-স্তূপের বেষ্টনী-স্তম্ভে এই বিহারের যে খোদিত চিত্র দৃষ্ট হয় তাহাতে মনে হয়, বোধিদ্রুমের চারিপার্শ্বে স্তম্ভোপরি প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বিতল গৃহ ছিল। গৃহতোরণের পুরোভাগে শিলাস্তম্ভের উপর এক হস্তিমূর্ত্তি খোদিত ছিল। উরুবিল্ব গ্রামের অন্য নাম ছিল মহাবোধি. ঐ নাম অতঃপর বুধগয়ায় পরিণত হইয়াছে। বুধগয়ার বর্ত্তমান মন্দির কখন নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায় নাই। যে স্থলে বুধগয়া মন্দির ও স্তম্ভাদি নির্ম্মিত হইয়াছে ঐ গ্রাম পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ড হইতে পঞ্চাশ হাত উচ্চ জমির উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ঢিবি মহাবোধির ধ্বংসাবশেষ। ইহার কিয়দংশ খনন করিয়া মহাবোধি মন্দিরের প্রাচীর ও নিম্নভাগ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মন্দির প্রাঙ্গণ খননকালে দুই একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই মন্দিরের অনুকরণে আধুনিক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরে প্রস্তরনির্ম্মিত সিংহাসনোপরি ভগবান্ বুদ্ধের ধ্যাননিরত মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহাই সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাকে। সিংহাসনের গাত্রে খোদিত লিপি পাঠে জানা যায় যে, ছিন্দবংশীয় কোন রাজা এই মূর্ত্তি ও সিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে স্তম্ভ পরম্পরায় বেষ্টনী নির্ম্মিত হইয়াছিল। অনেক স্তম্ভেই খোদিত লিপি আছে। অধিকাংশ স্তম্ভই এক্ষণে ভগ্ন ও স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে। মন্দিরের চারিদিক ক্ষুদ্র বৃহৎ স্তূপ ও চৈত্যের ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ। বুদ্ধগয়ার মাঠে তথাকার আবিষ্কৃত বহু-সংখ্যক বুদ্ধমূর্ত্তি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। এই বুদ্ধমূর্ত্তি, স্তূপ ও কারুকার্য্যময় মন্দির এবং বেষ্টনীমধ্যে যুগ যুগান্তরের শিল্পসাধনা-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রহিয়াছে।

সারনাথ

কাশীর অদূরবর্ত্তী সারনাথ এক সময়ে মৃগদাব বা ঋষিপত্তন নামে খ্যাত ছিল। এই স্থলে ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার সদ্ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথমে প্রচারিত করিয়াছিলেন। এই স্থান বৌদ্ধ মাত্রের নিকট পরম পবিত্র পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ উক্ত আছে যে, এই স্থলে ভগবান্ বুদ্ধ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন জন্মে মৃগরূপ ধারণ করিয়া এক হরিণীকে তাহার শিশু-সন্তানসহ রক্ষা করিয়াছিলেন। এইজন্য ঋষিপত্তন বৌদ্ধদের নিকট 'মৃগদাব' নামে খ্যাত। এই স্থলে ভূগর্ভ হইতে যে সকল মূর্ত্তি, স্তূপ ও বিবিধ দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই সমুদয়ের শিল্পশোভা দর্শকমাত্রের চিত্তে অপূর্ব্ব বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। এইস্থলে যে সকল বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে সে সমস্ত আজিও নবনির্ম্মিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পদ্মাসন, বীরাসন, রাজাসন ও বজ্রাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তিগুলির মুখে কি শান্তি, কি পবিত্রতা, কি কমনীয় সৌন্দর্য্য প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে তাহা না দেখিলে কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। সেই বৌদ্ধ-যুগের সাধন-নিরত ভাস্করশিল্পিগণ এমন সুকৌশলে এই সকল মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন যে কাল ইহাদের অক্ষয় সৌন্দর্য্য বিনষ্ট করিতে পারে নাই।

আধুনিক সারনাথ বারাণসী ধামের নিকটবর্ত্তী একটি গ্রাম। বুদ্ধের সময়ে সারনাথ বারাণসীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহার স্বতন্ত্র নাম হয়ত ছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে অনেকস্থলেই উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ বুদ্ধ বারাণসীধামে "ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন" করেন। বুদ্ধ স্বয়ং বলিয়াছেন,—'আমি ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন জন্য বারাণসী যাইতেছি।'

বৌদ্ধশিল্পীগণ ধর্ম্মচক্রের যে খোদিত চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা যেমন শিল্পশোভায়, তেমন ভাবের গভীরতায় পরিপূর্ণ। ধর্ম্মচক্রের সর্ব্বাংশ সুমসৃণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। আলোকদানবৎ এক স্তম্ভের উপরিভাগে এক চক্র স্থাপিত, ইহার উপরে চারিটি সিংহ দণ্ডায়মান। এই চক্রের উভয়পার্শ্বে দুইটি মৃগ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

এই সমস্তের সমবায় ধর্ম্মচক্র বলিয়া কথিত হয়। এই ধর্ম্মচক্র মানবজীবনের জন্মমৃত্যু প্রভৃতি রহস্যের সূচক। উহারই ধ্যান করিয়া মানুষ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকে। বৌদ্ধ-সাধক ধ্যান করেন ভগবান্ বুদ্ধের জন্ম, বোধিলাভ, ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন ও পরিনির্ব্বাণ।

যে স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবান্ বুদ্ধ সর্ব্বপ্রথমে পঞ্চশিষ্য সমীপে তাঁহার আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ, অন্তকল্যাণ সদ্ধর্ম্মের কাহিনী বিবৃত করেন তথায় এক স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল। সেই স্তম্ভোপরি এক সিংহমূর্ত্তি এবং উহার গাত্রে মহারাজ অশোকের অনুশাসন রহিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত মহামতি অশোক ভারতবর্ষের সর্ব্ব অংশে ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। লোক-সাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি যেমন ভারতের সর্ব্বত্র ও বিভিন্ন দেশে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন তদ্রূপ স্তম্ভ, স্তূপ, চৈত্য ও বিহার নির্ম্মাণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের তথ্য খোদিত লিপি ও চিত্রদ্বারা জনসাধারণের প্রত্যক্ষ গোচর করিয়া দিয়াছিলেন।

স্তূপ সমূহের শিল্পশোভা বিশেষরূপ হৃদয়স্পর্শী। স্তূপের বেষ্টনীর তিনটি স্তম্ভ বুদ্ধ, সঙ্ঘ ও ধর্ম্ম এই ত্রিশরণ সূচনা করে। স্তূপের চারিদ্বারে মহাপুরুষ বুদ্ধের জন্ম, বোধিলাভ, ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন ও পরিনির্ব্বাণলাভের মনোহর চিত্র রেখাক্ষরে অঙ্কিত থাকে। নীল আকাশ যেমন চক্রাকারে সকল দিক হইতে ধরিত্রীর সহিত মিলিত হইয়াছে স্তূপের টোপর তেমন উদ্ভিন্ন নীলকমলের ন্যায় নিম্নমুখ হইয়া ভূমিস্পর্শ করিতেছে। টোপরের তলদেশ হইতে যে পাঁচটি স্তম্ভ উত্থিত হইয়াছে তাহা বিশ্বের উপাদান ক্ষিতি, অপ্, তেজ্, মরুৎ ও ব্যোম সূচনা করিয়া থাকে। বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বের দেহ ধাতুর উপরে যে বৃক্ষ অঙ্কিত থাকে উহা বোধিদ্রুম সূচক।

সম্রাট্ অশোক হীনযান বৌদ্ধ ছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধকে তিনি মহাপুরুষরূপেই পূজা করিতেন, তাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া মানিতেন না। বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্ব যাহাতে লোকসাধারণের বোধগম্য হয়

তজ্জন্য তিনি বুদ্ধের উপদেশ তাঁহার পুণ্যময় জীবনের ঘটনাবলী নানা উপায়ে লোকমধ্যে প্রচারিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ইহা মহতের পূজা। হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধগণ এই ধর্ম্মকে অন্ধ কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা হইতে রক্ষা করিতে কিরূপ সচেষ্ট অশোকের স্তূপাবলীর মধ্যে উহার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

সারনাথের ধামেক স্তূপ বুদ্ধগয়ার স্তূপের অনুরূপ। কানিংহাম সাহেব তৎপ্রণীত মহাবোধি গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—'এইস্থানে স্তূপের সংখ্যা অসংখ্য, আখ্রোটের সদৃশ দুই কি তিন ইঞ্চি উচ্চ বহুস্তূপ এখানে বিদ্যমান। সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" কালক্রমে অযত্নে এইগুলি নষ্ট হইয়াছে। ধামেকস্তূপ মহারাজ অশোক নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধ যে স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া পঞ্চশিষ্যকে সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাঁহার নবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন 'চৌখণ্ডী স্তূপ' সেই পবিত্র ভূখণ্ডে নির্ম্মিত হইয়াছে।

সারনাথের নাম এক সময়ে ভারতবর্ষের বাহিরে দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। অনেক পরিব্রাজক তাঁহাদের জীবন সার্থক করিবার জন্য এই স্থলে আগমন করিয়াছেন। চীনপরিব্রাজক ফাহিয়েন, উয়ান চুয়াঙ্, ই-চিঙ্ এই পুণ্যতীর্থ সম্বন্ধে নানা কথা লিখিয়াছেন। উয়ান চুয়াঙ্ যখন সারনাথে আসিয়াছিলেন তখন তথায় দেড় সহস্র শিক্ষার্থী বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন।

সারনাথে বহুবর্ষ খননের ফলে বৌদ্ধভারতের এক নগরের জীবন্ত ভূদৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। গর্ভ হইতে এক বৃহৎ বৌদ্ধবিহার, প্রকাণ্ড বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি, নানাপ্রকার বুদ্ধমূর্ত্তি, দাস দাসী, নর্ত্তক নর্ত্তকী, মুটে, মজুর, দ্বারী ও মল্ল-মূর্ত্তি, অসংখ্য প্রকার স্ত্রী মূর্ত্তি, বিবিধ কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরফলক, এমন কি হুঁকা, কলিকা, প্রদীপ, কলসী, মাল্সা প্রভৃতি দ্রব্য অভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। সারনাথের মিউজিয়মে এই সকল দ্রব্য সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। দর্শকগণ তথায় গমন করিয়া বৌদ্ধভারতের শিল্পশোভা ও সমাজ চিত্রের যুগবৎ পরিচয় পাইতে পারেন।

সাঁচি

সাঁচি স্তূপে সম্রাট্ অশোকের এক অনুশাসন লিপি রহিয়াছে। ভূপাল রাজ্যের ভিল্সা গ্রামের উত্তর-দক্ষিণে ৬ মাইল এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১০ মাইল মধ্যে বহুসংখ্যক স্তূপ আছে। সাঁচি স্তূপ এই সকলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সাঁচির পুরাতন নাম চৈত্যগিরি। এই স্তূপে কাহার দেহ-ধাতু সমাহিত হইয়াছিল তাহা জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু বৃহৎ স্তূপের চারিদিকে যে রমণীয় বেষ্টনী রহিয়াছে তদুপরি অশোক যুগের অক্ষরে লিখিত বহু অনুশাসন দৃষ্ট হইয়া থাকে। জেনারেল কানিংহাম বলেন, এই স্তূপ অশোকের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্তূপের শোভা বর্ণনা করিয়া ডাক্তার ফার্গুসন লিখিয়াছেন,—

এই চারি তোরণের সম্মুখে ও পশ্চাতে বিবিধ কারুকার্য্য রহিয়াছে। সাধারণতঃ রেখাক্ষরে বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনা খোদিত করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন জাতকের বহু আখ্যানও খোদিত রহিয়াছে। সিংহলী পুস্তকে যুদ্ধ, অবরোধ, জয়লাভ প্রভৃতি যে সকল আখ্যান বিবৃত আছে সেই সমস্ত ইতিহাস এখানে রেখাক্ষরে অঙ্কিত হইয়াছে। নরনারীর পানাহার, আমোদপ্রমোদ ও প্রেমের চিত্রও খোদিত রহিয়াছে, তোরণসমূহে যে চিত্র খোদিত আছে উহাকে প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধশাস্ত্রের চিত্রপুস্তক বলিতে পারা যায়।

আলঙ্কারিক কারুকার্য্যে বৌদ্ধযুগের বেষ্টনী ও তোরণগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ। সাধারণতঃ স্তূপ সমূহের চারিদিকেই এই বেষ্টনী ও তোরণ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এলাহাবাদ ও জব্বলপুরের মধ্যবর্ত্তী ভারহুত-স্তূপের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী পল্লীর অজ্ঞ সাধারণ ঐ স্তূপের বিশেষত্ব অনুভব করিতে না পারিয়া উহার ইষ্টক খসাইয়া আপনাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়োজন পূরণ করিয়াছে। বেষ্টনীর অর্দ্ধাংশমাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে।

চৈত্য

পর্ব্বতের গাত্র খুঁড়িয়া গুহা-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ তাঁহাদের ধর্ম্ম সভার অধিবেশন করিতেন। এই সভাভবন-গুলি চৈত্য নামে অভিহিত হইত। ভগবান্ বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ লাভের পরে রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল। রাজা অজাতশত্রু ঐ সভাভবন প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন।

গুহাভবনগুলির সম্মুখভাগ ব্যতীত অপর কোন অংশ বাহির হইতে দেখা যায় না বলিয়া হিন্দু ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম মন্দিরের মত চৈত্যগুলি বাহ্যতঃ জাঁকাল বলিয়া অনুভূত হয় না। ভারতবর্ষের নানা অংশে বিশেষতঃ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে অনেকগুলি চৈত্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ বোম্বাই অঞ্চলের পর্ব্বতমালা গুহাখননের পক্ষে বিশেষ অনুকূল বিবেচিত হইয়াছিল।

উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের সমীপবর্ত্তী উদয়গিরির হস্তি-গুম্ফা, গণেশ-গুম্ফা, রাজরানী-গুম্ফা এবং ব্যাঘ্র-গুম্ফা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈত্য কিম্বা বিহার। বোম্বাই পোতাশ্রয়ের নিকটবর্ত্তী ঘরপুরী দ্বীপ হস্তিগুহাপুঞ্জের নিমিত্ত "এলিফেণ্টা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দ্বীপে চারিটি গুহা-গৃহ আছে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গুহা ২৫০ ফিট উচ্চ এক পাহাড়ের উপরে খোদিত হইয়াছে। উহার দৈর্ঘ্য ১৩০ ফিট। গুহামধ্যে এক ত্রিমস্তক বিগ্রহ বিরাজিত, মূর্ত্তির পুরোভাগে দুইটি খোদিত রক্ষক মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই ত্রিমূর্ত্তি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বুদ্ধ, সঙ্ঘ ও ধর্ম্মেরই রূপান্তর। হ্যাভেল সাহেব বলেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন মূর্ত্তি সূর্য্যের তিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রূপ। ব্রহ্মা উদয়কালীন সূর্য্য—তখন বিশ্বকমল মুকুলিত হয়। বিষ্ণু মধ্যাহ্ন রবি—বিশ্ব সমুদ্রের উপর শেষ নাগের শয্যায় শায়িত অনন্ত। শিব অস্তকালীন ভানু—অন্ধকার অসুরগণকে দলন করিবার জন্য তিনি শশি-মৌলী হইয়াছেন। আমাদের গায়ত্রী মন্ত্রও অনুরূপ

আদিম সৌরোপাসনার সহিত বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে।

বোম্বাই পোতাশ্রয়ের সলসেটি দ্বীপের কেনেরী গুহাপুঞ্জ প্রকৃতির নিভৃত রম্য নিকেতনে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ সাধু-দিগের দেবায়াতন ও বাসভবনগুলি দেখিলে মনে হয় ইহাদের সৌন্দর্য্যানুভূতি অতি উচ্চ ছিল। কেনেরীতে ১২০টি গুহা আছে। তন্মধ্যে ১৫টি ব্যতীত অপর সকলগুলি এখন এমন পরিষ্কৃত অবস্থায় আছে যে তথায় বসবাস করা যাইতে পারে। ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে যখন হিন্দুধর্ম্ম নূতন বলে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল তখন ভারত-বর্ষের নানাস্থলের বিহার হইতে বিতাড়িত বৌদ্ধ সাধুগণ কেনেরী দ্বীপের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখনও এখানে বৌদ্ধ প্রভুত্ব অপ্রতিহত ছিল। অতঃপর বৌদ্ধ সাধুগণ সিংহল, যবদ্বীপ এবং চীন প্রভৃতি দেশে প্রস্থান করেন। কেনেরী বিহার এক সময়ে বিদ্যালোচনার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত হইত।

করালী

অজন্তায় চারিটি চৈত্য আছে। এলোরার বিশ্বকর্ম্মা গুহাও প্রসিদ্ধ চৈত্য সমূহের মধ্যে শিল্প শোভায় করালীর গুহা সুপ্রসিদ্ধ। ফাগুসন সাহেব এই করালী গুহার শোভায় মোহিত হইয়া বলিয়াছেন—

করালী বোম্বাই ও পুনার মধ্যবর্ত্তী এক পল্লী, ইহার চারিদিকের শ্যামল শোভা নেত্রপ্রীতিকর। এই শান্তসুন্দর পল্লীর নিসর্গশোভার মধ্যে করালীর গিরি-গুহা অবস্থিত। এই চৈত্যটি ভারতীয় চৈত্য সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার দৈর্ঘ্য ৮৪ হস্ত, বিস্তার ৩০॥০ হস্ত। এই গুহার প্রবেশ পথে প্রত্যেকদিকে ১৫টি করিয়া অষ্টকৌণিক স্তম্ভ আছে। স্তম্ভের শিরোভাগে দুইটি করিয়া নতজানু হস্তী আছে। হস্তীর উপরে দুইটি করিয়া মনুষ্যমূর্ত্তি। সাধারণতঃ একটি পুরুষ একটি স্ত্রীলোক, তবে কোন কোন স্থলে দুইটিই

স্ত্রীমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। গৃহতল হইতে ৩১ হস্ত ঊর্দ্ধে খিলান করা ছাদ, উহার গম্বুজটি অর্দ্ধ গোলাকার। খিলানের তলে গৃহ মধ্যে এক স্মৃতিমন্দির (dagoba) রহিয়াছে। ইহার উপরে ক্ষুদ্র গম্বুজ আছে, তদুপরি ধ্বংসপ্রায় এক কাষ্ঠছত্র বিরাজিত।

গুহার সম্মুখস্থ সোপান আরোহণ করিলে দ্বিতলের সুপ্রশস্ত কক্ষে গমন করা যায়। তাহার পরে আরও একটি বৃহৎ কক্ষ আছে। এই কক্ষের তিন পার্শ্বে চৌদ্দটি ছোট ছোট ঘর আছে।

করালী গুহার বহির্ভাগে ও অভ্যন্তরস্থ চন্দ্রাতপে যে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য আছে পাষাণ চন্দ্রাতপে ঐরূপ শিল্পনৈপুণ্য আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। এই শিল্পশোভার জন্যই করালী-গুহা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই কারুকার্য্যময় ছাদ নষ্ট হইতেছিল, যথাসময়ে উহার সংস্কার সাধিত হওয়ায় এই পুরা-কীর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ফার্গুসন সাহেব লিখিয়াছেন—

It would be thousand pities if this which is the only original screen in India were allowed to perish.

অর্থাৎ ভারতের এই একমাত্র মৌলিক চন্দ্রাতপটি নষ্ট হইতে দিলে উহা পরম ক্ষোভের বিষয় হইত।

এই গুহার মধ্যস্থলে ও দক্ষিণ দ্বারের বাম পার্শ্বে ভগবান্ বুদ্ধের পরম রমণীয় খোদিত মূর্ত্তি রহিয়াছে।

বিহার

বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুত্থান কালে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অসংখ্য বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল। মগধরাজ্যের সর্ব্বত্রই বিহার ছিল বলিয়া উক্ত-রাজ্য "বিহার" নাম ধারণ করিয়াছিল। বৈশালীর জেতবন, রাজগৃহের বেণুবন ও গৃধ্রকূট প্রভৃতি কয়টি ভিক্ষু নিবাসের নাম বিনয়পিটকে দৃষ্ট হয়। মগধরাজ বিম্বিসার বেণুবন প্রমোদ উদ্যান ভিক্ষুসঙ্ঘকে

দান করিয়াছিলেন। বুদ্ধের জীবিতকালে বিহার সংখ্যা তত অধিক ছিল বলিয়া মনে হয় না।

পাটনার নিকটবর্ত্তী বনগাঁও গ্রামের নালন্দা বিহার অতি প্রসিদ্ধ। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক উয়ান চুয়াঙ্ এই বিহারে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। এখানকার ভিক্ষুনিবাস সমূহের চতুর্দ্দিকে ১৩০০ ফিট দীর্ঘ, ৪০০ ফিট প্রস্থ এক প্রাচীর ছিল। ঐ প্রাচীর অংশতঃ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীরের বহির্দ্দেশেও অনেক স্তূপ ও মন্দির রহিয়াছে। সারনাথের ন্যায় নালন্দায় একটি মিউজিয়ম্ আছে। আবিষ্কারলব্ধ দ্রব্যরাজি তথায় শৃঙ্খলা সহকারে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বের মৃৎপাত্রগুলি অভগ্ন অবস্থায় বাহির করা হইয়াছে। অনেকগুলি শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের। উহাতে লেখা "শ্রীনালন্দা মহাবিহারী আর্য্য ভিক্ষু সংঘস্য"। প্রস্তর ও ধাতুর উপর উৎকীর্ণ ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা প্রকার বুদ্ধমূর্ত্তি এখানে পাওয়া গিয়াছে। জন্ম হইতে পরিনির্ব্বাণ লাভ পর্য্যন্ত বুদ্ধের জীবনের সকল ঘটনা ১০।১২ আঙ্গুল দীর্ঘ, ৭।৮ আঙ্গুল প্রস্থ প্রস্তরে খোদিত হইয়াছে। এখানকার মিউজিয়মে সেই যুগের তণ্ডুল রহিয়াছে' তণ্ডুলের কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ, অপরগুলি এখনও নূতনবৎ শুভ্র। এখানে খনন করিয়া এক সুবৃহৎ ভবন উদ্ধার করা হইয়াছে। অনুমিত হয় ঐ গৃহ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তম ভবন। ইহার দ্বিতলের ছাদ বা প্রাকার নাই। নিম্নতলে ও মধ্যস্থলে সুবৃহৎ অঙ্গন। এখানকার ঘরগুলির প্রত্যেকটিতে দুইটি বৃহৎ এবং দুইটি ক্ষুদ্র বাঁধান স্থান আছে। এইরূপ অনুমিত হয় যে, বিদ্যার্থীরা বৃহৎ বাঁধান স্থলে শয্যা রচনা এবং ক্ষুদ্র বাঁধান স্থলে পুস্তক দ্রব্যাদি রাখিতেন।

অজন্তা

ভারতীয় বিহারসমূহের মধ্যে শিল্পশোভায় অজন্তা সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র নাথ গুপ্ত

মহাশয় প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত "অজন্তা গুহার চিত্রাবলী" শীর্ষক পাঁচটি প্রবন্ধে উক্ত গুহার সর্ব্বপ্রকার চিত্রের আভাস প্রদান করিয়াছেন। তিনি তথাকার চিত্র শোভায় মোহিত হইয়া লিখিয়াছেন—"অজন্তা ভারতশিল্পের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান; সেই পুণ্যতীর্থে না যাইলে ভারত-বাসী কোন শিল্পীরই সাধনা পূর্ণ হয় না। এককালে অজন্তার নাম ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এবং অন্যান্য দেশে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। অজন্তা এককালে সুবৃহৎ বৌদ্ধ মঠ ছিল। ধর্ম্মমঠের স্থান কি প্রকার হওয়া উচিত অজন্তা যাইলে তাহা অনুভব করা যায়। রমণীয় অরণ্যের মধ্যে একটি পর্ব্বতের গায়ে সারি সারি খোদাই করা প্রশস্ত গুহা। নিম্নে স্বল্প-সলিলা প্রবাহিনী। উপরে অরণ্যের শ্যামল শোভা, স্থানটি নিভৃত নির্জ্জন; সাংসারিক কোলাহল ও অশান্তি হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপযুক্ত স্থান।"

অজন্তা গুহা হাইদরাবাদের নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত। এই গুহা ইন্দ্রিয়াদ্রি নামক পর্ব্বতের গাত্রে উৎকীর্ণ। জলগাঁও নামক রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ত্রিশ ক্রোশ।

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পর্ব্বতে মোট ২৯টি গুহা খোদিত হইয়াছে। এতন্মধ্যে কয়টির খনন কার্য্য অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। গুহাগুলির মধ্যে চারিটি চৈত্য, অপরগুলি বিহার। ইতিহাসজ্ঞেরা বলেন, খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় হইতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী মধ্যে এইসকল খোদিত এবং ১ম হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত তত্রত্য চিত্রাবলী অঙ্কিত হইয়াছে।

মদীয় সুহৃদ্ বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয় চিত্রশিল্পের অন্যতম পীঠস্থান অজন্তা ভ্রমণ করিয়া "অজন্তা" নামক পুস্তকে উক্ত গুহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:—

"প্রথম প্রথম কোন্‌টা ছেড়ে যে কোন্‌টা দেখ্‌বো তা ভেবেই ঠিক কর্‌তে পার্‌তুম না। মনে হত যেন কি এক স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে এসে আত্মহারা হয়ে পড়েছি। পরবর্ত্তী সময়ের মোগল চিত্র দেখে এরকম

ভাব কখনও হয় নি। মোগল চিত্র চোখের সামনে ধরে তার মধ্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিল্পের বিচার ক'রে তবে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যায়। মোগল চিত্রে আমরা প্রধানতঃ বিলাস ও ক্রীড়ার ভাবই দেখ্‌তে পাই। কিন্তু সমস্ত বৌদ্ধ চিত্রই একটা আধ্যাত্মিক আবেগ ও শান্তির ভাবে মণ্ডিত। এমন কি যুদ্ধ বিদ্রোহের ছবিতে পর্য্যন্ত ধর্ম্মভাব প্রবেশ করেছে। তা'হলে বুঝ্‌তে হবে মোগল শিল্প বিলাসপ্রধান এবং বৌদ্ধশিল্প শান্তিময়।"

"মোগলদের চিত্র রচনা প্রণালী, বৌদ্ধশিল্পীদের চিত্ররচনা

বাদক দল

প্রণালীর মধ্যে একটা বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য আছে। মোগল শিল্পীরা চিত্রের যে ভাব অতি চেষ্টা ও যত্নে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দ্বারা ফুটিয়ে

তোলেন, বৌদ্ধ শিল্পীরা সেটা দুই চারটে সরু মোটা টানে অল্পায়াসে দেখিয়ে দিয়েছেন। বৌদ্ধচিত্র শিল্পীদের এরূপ রেখাঙ্কনের দক্ষতা মোগল কেন পৃথিবীর কোন দেশের শিল্পীদের ছিল কি না সন্দেহ।"

"অজন্তা চিত্র বর্ণসমাবেশেও মনোহর। তার প্রতিবর্ণ চোখে স্নিগ্ধ শীতল ভাব আনে। মোগল কিংবা অন্য কোন শিল্পে সে রকমটা প্রায় দেখা যায় না। বৌদ্ধ আর মোগল চিত্র উভয়েরই রঙের একটা প্রধান গুণ, শত শত বৎসরের পুরাতন মোগল ছবি এবং সহস্র সহস্র বৎসরের জীর্ণ বৌদ্ধ ছবিগুলির কোনটিরই বর্ণের অদ্যাপি কোন পরিবর্ত্তন ঘটেনি। সেগুলি যেন চির নবীন। অজন্তার ছবি দেখ্‌লে মনে হয়, এই মাত্র বুঝি কেউ রং দিয়ে গেল।"

"আলঙ্কারিক শিল্প সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও মোগলশিল্পীরা প্রায় সমকক্ষ। অজন্তা গুহার শীর্ষদেশের সজ্জা এক বিচিত্র কাণ্ড। হঠাৎ দেখ্‌লে মনে হয় যেন মাথার উপরে একখানি বহুমূল্য শালের চাঁদোয়া টাঙ্গান রয়েছে। প্রত্যেক চাঁদোয়ার মধ্যে একটা করে প্রকাণ্ড শ্বেতপদ্ম বিকশিত; আর তার চারিধারে গোল ভাবে সজ্জিত সারি সারি হাঁস কিংবা ময়ূর অথবা মৃণাল-দল-মন্থন-তৎপর হাতীর পাল, এবং চার কোণে নানারকম লতাপাতার কাজ। সে গুলির মধ্যে একটা বিশেষ অর্থ আছে তা দেখ্‌লেই বোঝা যায়। মোগল আলঙ্কারিক চিত্র সূক্ষ্মতার হিসাবে শ্রেষ্ঠ বটে; কিন্তু অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্রের মত অর্থপূর্ণ বলিয়া মনে হয় না।"

"অজন্তা গুহার গাছপালার চিত্রগুলিও নিখুঁত। মোগল চিত্রেও বৃক্ষাদির ছবি অতি সুন্দর। পাশ্চাত্য শিল্পীদের মত তাঁরা শুধু তুলির স্পর্শে একটা গাছের ভঙ্গী খাড়া করে নিশ্চিন্ত হন না, তাঁরা যতদূর সম্ভব গাছের পাতাগুলি এমন কি গুঁড়ির আকারের তারতম্য ঠিক ভাবে এঁকে তার পরিচয় দিয়ে দেন অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় চিত্রের গাছপালা দেখ্‌লে জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয় না—'এটা কি গাছ'?"

অজন্তার ১ নং গুহায় সৌম্য ও সুন্দরকান্তি ভগবান্‌ বুদ্ধের গৃহত্যাগের একখানি মনোহর চিত্র আছে। সেই ছবির শোভা যেন

ঐ গুহাকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। বুদ্ধ যে বিশ্বপ্রেমে

ভগবান্ বুদ্ধের সম্মুখে আশীর্ব্বাদ-প্রার্থী মাতা ও পুত্র।

বিহ্বল হইয়া জগতের কল্যাণ কামনায় সংসার ত্যাগ করিতেছেন তাঁহার মুখমণ্ডলে সেই ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে।

এই গুহায় ভগবান্ বুদ্ধের মারজয়ের যে চিত্র আছে তাহাও

বিশেষরূপ ভাবব্যঞ্জক। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও বুদ্ধ গভীর ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। তাঁহাব মন শান্তিব যে আলোকময় বাজ্যে বিরাজিত,

ভিক্ষার্থী ভগবান্ বুদ্ধের সম্মুখে মাতা ও পুত্র (খোদিত মূর্ত্তি)

প্রলোভন তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। কাম পরমা সুন্দরী নারী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, মোহ দানববেশে, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতিও নানা

আকার পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য কৌশলজাল বিস্তার করিতেছে। কিন্তু ধ্যানমগ্ন মহাযোগীর তপঃপ্রভাবের নিকট ইহারা সকলেই পরাভূত হইল।

অজন্তার ১৭ নং গুহা বহু শোভন চিত্রে অলংকৃত। ভিখারী বেশধারী ভগবান্ বুদ্ধের সম্মুখে সপুত্র জননীর খোদিত ছবিখানি ঐ গুহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শোভা। উদারমূর্ত্তি দীর্ঘকায় বুদ্ধ দাঁড়াইয়া আছেন, নরনারীর দুঃখে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত, তাঁহার অন্তরের সেই অনন্ত করুণা মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি ভিখারী বেশে এক নারীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। সেই জননীও পুত্রের হস্তে ভিক্ষার দ্রব্য দিয়া আপনার দুই হস্তে পুত্রের হাত ধরিয়া ভিক্ষা দিতেছেন। ভগবান্ বুদ্ধের ভাববিহ্বল মুখের সৌম্য কান্তি দর্শনে মাতাপুত্র উভয়ে বিস্ময়ে বিকল হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। বালকের মুখে সরলতা ও নির্ভীকতা এবং জননীর মুখে আত্মনিবেদনের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ছাদের আলংকারিক চিত্র

অজন্তাগুহায় ভগবান্ বুদ্ধের জীবনের সকল ঘটনা এবং বৌদ্ধজাতকের অসংখ্য চিত্র আছে। ধর্ম্মের

যে সকল কথা ভাষায় প্রকাশ করিলে জটিল হইয়া উঠিত চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে রেখাক্ষরে তাহা প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে রাজসভা, যুদ্ধবিদ্রোহ, দাম্পত্যপ্রেম, ব্যঙ্গচিত্র প্রভৃতির অভাব নাই; বহু ঐতিহাসিক চিত্রও অজন্তায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। সৌন্দর্য্যের উন্মেষের জন্য এখানে আলঙ্কারিক চিত্রকলাও অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকলের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার এক সুর ধ্বনিত হইতেছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দী হইতে বৌদ্ধশিল্পের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। উড়িষ্যার হস্তি-গুম্ফা, ব্যাঘ্র-গুম্ফা প্রভৃতি বৌদ্ধশিল্পের স্থূল প্রারম্ভ সূচনা করিয়া থাকে। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দী হইতে এই শিল্প অসামান্য উন্নতি লাভ করে। ঐ সময় হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত কয় শত বৎসর মধ্যে ভারতবর্ষে অসংখ্য স্তম্ভ, স্তূপ, চৈত্য, বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সকলের শিল্পশোভা দর্শকগণের হৃদয়রঞ্জন করিয়া থাকে। হীনযান বৌদ্ধগণ বুদ্ধকে মহামানবরূপে শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহাকে পরমেশ্বরের আসনে স্থান দান করেন নাই, এই জন্যই বোধ হয় অশোক-যুগের শিল্পের শোভা হৃদয়স্পর্শী হইলেও ঐ যুগের শিল্প গভীর আধ্যাত্মিকতায় মহোচ্চ হইয়া উঠিতে পারে নাই।

অতঃপর মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মে যখন ভক্তিবাদ দেখা দিল, মানুষ বুদ্ধ যখন পরমেশ্বরের স্থান অধিকার করিলেন, তখন ভগবান্ বুদ্ধ ভারতীয় শিল্পীর হৃদয়ের সকল শ্রদ্ধা, সকল ভক্তি আকর্ষণ করিয়া লইলেন। তখন হইতেই শিল্পীরা তাঁহার জীবনের সকল ঘটনা মন্দিরে, বিহারে, চৈত্যে, গিরিগুহায় অঙ্কিত করিয়া আপনাদের ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া শিল্প উদার, বিশাল ও মহান্ হইয়া উঠিল।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীর পৌরাণিক মন্দিরসমূহে বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের সুস্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। তারপর ভারতে তামসী নিশার আবির্ভাব হইল। সেই তমিস্রার মধ্যে ভারতের গৌরবময় শিল্প কেমন করিয়া বিলুপ্ত হইল তাহা এখনও সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায় নাই।

একাদশ অধ্যায়

বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃতি

বৌদ্ধধর্ম্ম কেন স্বতন্ত্র বিশিষ্ট ধর্ম্মরূপে হিন্দুধর্ম্মের পার্শ্বে ভারতবর্ষে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত রহিল না, ইহা ভারত ইতিহাসের এক অমীমাংসিত সমস্যা। এই উদার মৈত্রীমূলক ধর্ম্ম ভারতীয় আর্য্য সভ্যতার উৎস হইতে উত্থিত হইয়া ইহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পৃথিবীর সভ্যতাকে নূতন আকার প্রদান করিয়াছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীতে এই ধর্ম্ম সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধদের পীতবস্ত্রে তখন জম্বুদ্বীপ পীতমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত সাত শত বৎসর মধ্যে ভারতবর্ষে অসংখ্য বৌদ্ধ গ্রন্থকারের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের সুনীতি ও দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করিয়া বহু গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন। রামানুজের সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের নানাস্থানে শিক্ষাকেন্দ্রে বৌদ্ধশাস্ত্রীয় অসংখ্য গ্রন্থ অধীত ও অধ্যাপিত হইত। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই সকল বৌদ্ধগ্রন্থের চিহ্নমাত্র ভারতবর্ষে দৃষ্ট হইত না।

নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম ও কোরিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে যদি আধুনিক কালের সুধীগণ বৌদ্ধগ্রন্থ সকল প্রাপ্ত না হইতেন তাহা হইলে এই কথা বলাও দুরূহ হইত যে এই সকল গ্রন্থ ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী একসময়ে রচনা করিয়াছিলেন।

ভগবান্ বুদ্ধের উদারধর্ম্ম যুক্তিমূলক। এই মহাপুরুষের ধর্ম্ম যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার মৃত্যুর পরে শ্মশানেই দেহাস্থি বিভাগ লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বুদ্ধের মৃত্যু-

শয্যায়ই তাঁহার শিষ্যগণ যুক্তিমূলক ধর্ম্মে নূতন ভাব সঞ্চার করিয়া যুক্তির সুনির্দ্দিষ্ট রেখা হইতে কথঞ্চিৎ দূরে গমন করিয়াছিলেন। বুদ্ধের শিষ্যগণ তাঁহার মৃত্যুপরে তদীয় উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া তদনুসারে ধর্ম্মসাধনায় নিরত ছিলেন। প্রায় এক শত বৎসর বৌদ্ধগণের মধ্যে বিশেষ কোন বিরোধ ঘটে নাই। অতঃপর নিয়ম পালন লইয়া বৌদ্ধ সঙ্ঘে বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিবাদের মীমাংসার জন্য বৈশালী নগরে এক মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল কিন্তু বিবাদের মীমাংসা না হইয়া বৌদ্ধগণ স্থবিরবাদী ও মহাসাঙ্গিক এই এই দুই দলে বিভক্ত হইলেন। জনবলে মহাসাঙ্গিকেরা প্রবল হইলেন। সম্রাট্ অশোক স্থবিরবাদী অর্থাৎ হীনযানী বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষণে এই ধর্ম্ম সিংহলে প্রচারিত হইয়া অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

মহারাজ কনিষ্কের রাজত্বকালে জালন্ধরে মহাসাঙ্গিকদের এক সভায় তাহাদের ধর্ম্মপুস্তক রচিত হয়। এই সময়ে মহাসাঙ্গিক মহাযানরূপে পরিণত হয়। এই মহাযান আবার মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে।

বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিয়া পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নারায়ণ পত্রিকায় লিখিয়াছেন ঃ—

(বৌদ্ধধর্ম্ম সহজ করিতে গিয়া, সহজযানীরা যে মত প্রচার করিলেন তাহাতে ব্যভিচারের স্রোত ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল। ভিক্ষুরা ক্রমশঃ খুব বাবু, বিলাসী এবং তাহার উপর অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া উঠিল।

মহাযান ধর্ম্ম খুব উঁচু ধর্ম্ম। কিন্তু মহাযান বুঝিতে, আয়ত্ত করিতে ও মহাযানের মতে কার্য্য করিতে বহুকাল লাগে, অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। ততটা সকলে পারিয়া উঠিত না। মহাযানের আচার্য্যেরা ইহার জন্য একটা সহজ পন্থা বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়া দিয়াছিলেন তোমরা 'ধারণী' মুখস্থ কর, 'ধারণী' জপ কর, ধারণীর পুঁথি পূজা কর—তাহা হইলেই তোমাদের মহাযানের

পাঠ, স্বাধ্যায়, যোগ সকলের ফল হইবে। "ওঁ ধুণ্‌ ধুণ্‌ ক্লীং ফট স্বাহা" প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত অর্থশূন্য মন্ত্রকে ধারণী বলে। এইরূপে যে কত ধারণী তৈয়ার করা হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না।

বৌদ্ধধর্ম্মে দেবতার সংস্রব নাই। দেবতার পূজা অর্চ্চনা-হীনযানে ছিলই না। বুদ্ধের মৃত্যুর ৪।৫ শত বৎসর পরে বুদ্ধমূর্ত্তি বিহারে প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে এক একটী করিয়া ধ্যানীবুদ্ধ আসিতে লাগিলেন। প্রথম "অমিতাভ", তারপর "অক্ষোভ্য", তারপর "বৈরোচন", তারপর "রত্নসম্ভব", তারপর "অমোঘ সিদ্ধি" আসিয়া জমিলেন। ক্রমে এই পঞ্চ তথাগতের পাঁচটী শক্তি দাঁড়াইল। শক্তি-গণের নাম 'লোচনা', 'মামকী', 'তারা', 'পাস্তরা', 'আর্য্যতারিকা'। পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের পঞ্চ শক্তিতে পাঁচজন বোধিসত্ত্ব হইলেন। তাহাদের মধ্যে "মঞ্জুশ্রী" ও "অবলোকিতেশ্বর" প্রধান। অবলোকিতেশ্বর করুণার মূর্ত্তি। তিনি মহোৎসাহে জীব উদ্ধার করিতেছেন সুতরাং তাঁহার পূজা খুব আরম্ভ হইল। সেবকের উৎসাহ অনুসারে তাঁহার অনেক হস্ত হইতে লাগিল। অনেক পদ হইতে লাগিল, অনেক মস্তক হইতে লাগিল। তাঁহার পূজা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিল। তারাদেবীও নানা রূপ ধরিয়া বৌদ্ধদের পূজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহার পরে অনেক ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচী, যক্ষিণী, ভৈরব বৌদ্ধ-গণের উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল।

বুদ্ধ দেবতা মানিতেন না। তাঁহার শিষ্যেরা শেষে ডাক, ডাকিনী, যোগিনী, প্রেত, প্রেতিনী, পিশাচ, পিশাচিনী, ভৈরব, ভৈরবী প্রভৃতির উপাসনা করিয়া আপনারা অধঃপাতে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে দেশটা সুদ্ধ অধঃপাতে দিল।

বৌদ্ধধর্ম্মে অনেক দিন হইতেই ঘুণ ধরিয়াছিল। বুদ্ধ নিজে যেদিন স্ত্রীলোকদিগকে দীক্ষা দিয়া ভিক্ষুণী করিতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন সেই দিন হইতেই তাঁহাকে সংঘের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য অনেক কঠোর নিয়ম করিতে হইয়াছিল। তিনি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের এক বিহারে থাকিতে দিতেন না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পাঁচ ছয়শত বৎসর

পর হইতে ভিক্ষুরা ক্রমে বিবাহ করিতে লাগিল—ক্রমে একদল গৃহস্থ ভিক্ষু হইল। এইখান হইতেই ঘুণ ধরা আরম্ভ হইল। সমাজে আসল ভিক্ষুদের খাতির অধিক ছিল, গৃহস্থ ভিক্ষুদের আদর তত ছিল না। কিন্তু গৃহস্থ ভিক্ষুদের নাম ছিল আর্য্য। আসল ভিক্ষুরা আর্য্যদের নমস্কার করিতেন না, কিন্তু অনার্য্য হইলেও আসল ভিক্ষুদের আর্য্যেরা নমস্কার করিতেন। এই গৃহস্থাশ্রমের ভিক্ষুরাই ক্রমে দলে পুরু হইতে লাগিল। কারণ তাহাদের সন্তান-সন্ততি হইত, তাহারা আপনা আপনি ভিক্ষু হইয়া যাইত। একজন গৃহস্থ গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া যদি ভিক্ষু হইতে যাইত—তাহাকে প্রথম "ত্রিশরণ" গ্রহণ করিতে হইত। তাহার পর "পুণ্যানুমোদনা" শিখিতে হইত, "পাপদেশনা" শিখিতে হইত, "পঞ্চশীল" গ্রহণ করিতে হইত, "অষ্টশীল" গ্রহণ করিতে হইত, "দশশীল" গ্রহণ করিতে হইত, "পোষধব্রত" ধারণ করিতে হইত—আরও কত কি করিতে হইত। ইহাতে তাহাদের অনেক সময় যাইত, কিন্তু গৃহস্থ ভিক্ষুর ছেলে সে একেবারেই ভিক্ষু হইত। যে সকল জিনিষ অন্যকে বহুকালে শিখিতে হইত, সে সকল বাড়ীতেই শিখিত, তবে আমাদের যেমন পৈতা একটা সংস্কার মাত্র উহাদেরও ঐ রকম ত্রিশরণ গ্রহণ, পঞ্চশীল গ্রহণ, এক একটা সংস্কারের মত হইয়া যাইত। আমাদের দেশে যেমন "জাত বৈষ্ণব" বলিয়া একটা জাতি হইয়াছে, সে কালেও তেমনি "জাতভিক্ষু" বলিয়া একটি জাতির মত হইয়াছিল। উহাদের যত দল পুষ্টি হইতে লাগিল, আসল ভিক্ষুদের অবস্থা তত হীন হইতে লাগিল। গৃহস্থ ভিক্ষুরা কারিগরি করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিত, ভিক্ষাও করিত, কেহ বা রাজমজুর হইত, কেহ বা রাজমিস্ত্রী হইত, কেহ বা চিত্রকর হইত, কেহ বা ভাস্কর হইত, কেহ বা স্যাকরা হইত, কেহ বা ছুতার হইত—অথচ ভিক্ষাও করিত, ধর্ম্মও করিত, পূজাপাঠও করিত। বৌদ্ধধর্ম্মের পৌরহিত্যটা ক্রমে ক্রমে আসিয়া কারিগরদের হাতে পড়িল। যে কাজে পরিশ্রম কম, ঘরে বসিয়া করা যায়—একটু হাত পাকিলে কাজও ভাল হয়, দুপয়সা আসেও বেশী, গৃহস্থ ভিক্ষু

সেই সকল কাজই করিত। সুতরাং তাহাদের ধর্ম্ম করিবার সময়ও থাকিত—বড় বড় উৎসবে দু'চার পয়সা খরচও করিতে পারিত কিন্তু বেশী লেখাপড়া শেখা, ধ্যান-ধারণা করা, ভাবনা চিন্তা করার সময়ও থাকিত না—প্রবৃত্তিও থাকিত না, তাহা হইলে মোট দাঁড়ায় এই যে বৌদ্ধধর্ম্মের পৌরহিত্যটা মূর্খ কারিগরদের হাতে পড়িয়া গেল। আসল ভিক্ষুরা বিহারে থাকিতেন। বিহারের জমি-জমার আয় হইতে কোনরূপে গুজরাণ করিতেন। ক্রমে রাজারা প্রায় বিধর্ম্মী হইয়া উঠিল। বৌদ্ধপণ্ডিত হইলে যে রাজ-সম্মান পাইবেন তাহার উপায় রহিল না। রাজারাও ছোট ছোট রাজা—আপনাদের পণ্ডিত পোষণ করিয়া আবার যে বিধর্ম্মী বৌদ্ধপণ্ডিত প্রতিপালন করিবেন, তাঁহাদের সে সাধ্য থাকিলেও তাঁহাদের পণ্ডিতেরা তাহা করিতে দিতেন না; সুতরাং আসল ভিক্ষুদের এবং তাহাদের বিহারের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল।

শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্ত বর্ণনা হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃতি সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে, কিন্তু এই অবনতি বা বিকৃতির জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে ইহা যুক্তিপূর্ব্বক স্বীকার করা যায় না। বিকৃতি কোন ধর্ম্মকে ইহার যথার্থ গৌরব হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না, নেড়া-নেড়ীরা যেভাবে বৈষ্ণবধর্ম্মের আচরণ করে উহার দ্বারা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রেমের ধর্ম্মের বিচার করা যায় না। ইন্দ্রিয়াসক্ত তথাকথিত বৌদ্ধদের পঞ্চম-কার সাধনা নির্ব্বাণ-বক্তা বুদ্ধের মৈত্রীমূলক সদ্ধর্ম্মকে গৌরবচ্যুত করিতে পারে না।

তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, এই সকল পাপাচার চরিত্রহীন বৌদ্ধগণের ক্রিয়াকাণ্ডে লোক সাধারণের মনে বৌদ্ধসমাজের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। বৌদ্ধসমাজ ধর্ম্মবলহীন হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে Sir Charles Eliot তৎপ্রণীত Hinduism and Buddhism গ্রন্থে বলিয়াছেন—

The aberration of Indian religion is not due to

its inherent depravity but to its universality. In Europe those who follow dis-reputable occupation rarely suppose that they have anything to do with church. In India robbers, murderers, gamblers, prostitutes and maniacs all have their appropriate gods.

ভারতীয় ধর্ম্মের অবনতি এই ধর্ম্মের কোন মৌলিক দুর্ব্বলতার জন্য ঘটে না, ইহার প্রকৃত কারণ ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা। ইয়ুরোপে যে সকল ব্যক্তি ঘৃণিত ব্যবসায়দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে, ধর্ম্মসমাজের সহিত তাহাদের কোন যোগ আছে এমন কথা কদাচিৎ তাহাদের স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে দস্যু, হত্যাকারী, প্রতারক, পতিতা-নারী, এমন কি পাগলও ইহাদের সকলে আপন আপন রুচি অনুসারে ঈশ্বর মানিয়া থাকে।

বৌদ্ধধর্ম্ম উদারভাবে এই ধর্ম্মের পতাকাতলে সকলকে আশ্রয় দান করিয়াছিল, ইহা এই ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক দুর্ব্বলতার হেতু হইলেও মহত্ত্বব্যঞ্জক।

কেহ কেহ বলেন যে, মুসলমান ধর্ম্মের অভ্যুত্থানই বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের কারণ। নব ধর্ম্মবল-দৃপ্ত মুসলমান আক্রমণকারীরা বৌদ্ধদের মন্দির ও চৈত্য ধ্বংস করিয়া সেই সেই স্থানে মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, কিন্তু কেবল মুসলমানদের এই আক্রমণই বৌদ্ধধর্ম্মকে দেশ ছাড়া করিয়াছে ইহাও সুযুক্তি বলিয়া মনে হয় না। মুসলমানেরা একমাত্র বৌদ্ধমন্দির ও বুদ্ধমূর্ত্তি বিনষ্ট করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা হিন্দু-মন্দির ও হিন্দুদেবদেবীর বিগ্রহ চূর্ণ ও বিকলাঙ্গ করিয়াছিল। মুসলমানদের আক্রমণের ভীষণতা হিন্দুধর্ম্ম সহ্য করিতে পারিয়াছিল কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম উহা সহ্য করিতে পারিলেন না কেন? বস্তুতঃ মুসলমান আক্রমণের বহু পূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইতেছিল।

মুসলমানেরা যখন ভারত আক্রমণে প্রবৃত্ত হইল তখন হিন্দুধর্ম্ম ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম কেবল মন্দিরমধে

নিবদ্ধ ছিল। এই জন্যই মুসলমানেরা মন্দির ও বিগ্রহ চূর্ণ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম নির্ম্মূল করিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে স্যর চার্লস্ ইলিয়ট লিখিয়াছেন—But where as Hinduism was spread over the country, Buddhism was concentrated in the great monasteries and when these were destroyed there remained nothing outside then capable of withstanding either the violence of the Moslims or the assimilative influence of the Brahmins.

তখন হিন্দুধর্ম্ম দেশব্যাপী ছিল কিন্তু যেহেতু বৌদ্ধধর্ম্ম বড় বড় মঠে আবদ্ধ ছিল সেইজন্য মঠগুলি যখন ভগ্ন হইল তখন এই ধর্ম্মের মুসলমানদের উৎপাত এবং ব্রাহ্মণদের আত্মস্থ করিয়া লইবার উদার প্রভাবের প্রতিকূলে দাঁড়াইবার আর সাধ্য রহিল না।

বৌদ্ধগ্রন্থে কোন কোন স্থানে বৌদ্ধ নির্য্যাতনের উল্লেখ আছে। ঐ নির্য্যাতন বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। নিখিল ভারতের বা ভারতের কোন বৃহৎ অঞ্চলের হিন্দুগণ কদাচ সাম্প্রদায়িকভাবে বৌদ্ধদিগকে দলন করে নাই বরং ইহাই বিস্ময়কর সত্য ঘটনা যে, ভারতবর্ষে হিন্দু ও বৌদ্ধগণ সহস্রাধিক বৎসর মিত্রভাবে পাশাপাশি বাস করিয়াছেন। ইয়ুরোপখণ্ডে প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানেরা রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদের দ্বারা যেমন ভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছেন, ভারতবর্ষে ধর্ম্মমত লইয়া তদ্রূপ শোণিতপাত ও হত্যাকাণ্ড কদাচ ঘটে নাই। যিনি বৌদ্ধধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছিলেন সেই সুবিখ্যাত বৌদ্ধভূপতি অশোক তাঁহার প্রজাপুঞ্জকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, বৌদ্ধসাধু ও ব্রাহ্মণ উভয়কে তুল্যরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে হইবে।

বৌদ্ধনির্য্যাতক বলিয়া যাঁহারা কুকীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কাশ্মীরাধিপতি রাজা মিহিরকুল, বঙ্গাধিপ নরপতি শশাঙ্ক এবং পুষ্যমিত্রের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহাদের ব্যক্তিগত সাময়িক অত্যাচার কদাচ সাম্প্রদায়িক আকার পরিগ্রহ করিতে পারে নাই।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী হইতে ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত পাঁচশত বৎসর মধ্যে কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য্য, উদয়নাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি ধর্ম্মাচার্য্যগণ জন্মগ্রহণ করিয়া দার্শনিক ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মমত এবং চরিত্রের প্রভাব লোকসাধারণের উপর পতিত হইয়াছিল। লোকমণ্ডলী দলে দলে ইঁহাদের মতানুবর্ত্তন করিয়া হিন্দুসমাজে নববলের সঞ্চার করিতে লাগিল। শঙ্করের মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। যে সকল সুধী বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া নূতন হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিতেন, তাঁহারা এই ধর্ম্মের উচ্চনীতি বরণ করিয়াই ইহাকে পরাভূত করিয়া থাকিবেন। ভগবান্ বুদ্ধ বিষ্ণুর অন্যতম অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। আর্য্যসভ্যতার বিশাল বক্ষ হইতে যে তরঙ্গ পর্ব্বতসমান উত্থিত হইয়াছিল সেই তরঙ্গ উক্ত সভ্যতার সহিতই বিলীন হইয়াছে। বুদ্ধের আষ্টাঙ্গিক সাধনামূলক ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, উহা নিখিল ভারতের চিরন্তন উদার ধর্ম্মমধ্যে স্বীয় স্বতন্ত্র-সত্তা মিশাইয়া দিয়াছিল। ভারতের বাহিরে চীন, জাপান, তিব্বত, সিংহল প্রভৃতি যে সকল দেশে আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের বিচিত্র বিকাশ দেখিতে পাই, সেই সকল দেশে এই ধর্ম্ম-মহীরুহের স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির প্রচুর অবকাশ আছে। তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, অধ্যাত্ম হিসাবে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল ভারতভূমিতেই অবিনশ্বরভাবে বিদ্ধ হইয়াছে এবং এই দেশই উক্ত ধর্ম্মকে এখনও নব নব আকার দান করিবে। ভারতের ভূমি খনন করিয়া এখন পণ্ডিতেরা বৌদ্ধমন্দির আবিষ্কার করিতেছেন। সাধকগণ ভারতের অধ্যাত্মভূমি খনন করিলে ইহাও প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন যে, বৌদ্ধসাধনা এই দেশে যে শিকড় বিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, উহা কোন দিন শুকাইয়া মরিয়া যায় নাই।

সাধন-ভজন হীন ও বিদ্যা-বিনয়শূন্য কারিগর বৌদ্ধেরা যখন সমাজের প্রভু হইল, ইহাদের ব্যভিচারে, অনাচারে যখন বৌদ্ধসমাজের প্রতি লোকে বীতশ্রদ্ধ হইল, তখন নবধর্ম্মবলদীপ্ত মুসলমান আক্রমণ-কারীরা এই ঘুণে-ধরা সমাজমন্দিরের উপর অবিমৃষ্যভাবে আঘাত

করিয়া ইহাকে ভূমিসাৎ করিয়াছিল। যে জীর্ণদীর্ণ মন্দির আপনি পতনোন্মুখ হইয়াছিল, মুসলমান আক্রমণকারীরা উহার শীঘ্র পতনে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিয়াছিল।

মুসলমানের আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। এই দেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পরেও উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল।

লামা তারনাথ তৎপ্রণীত বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থে লিখিয়াছেন—মুসলমানদের আক্রমণে বৌদ্ধ মন্দিরগুলি ধ্বংস হইবার পরে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ভারতবর্ষের নানা অংশে ছড়াইয়া পড়েন। এই কারণে ভারতবর্ষে নানা অংশে বহু শিলালিপি পাওয়া যাইতেছে। মুসলমানদের মগধ জয়ের পরেও দাক্ষিণাত্য, গুজরাট ও রাজপুতনায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। ঐ সকল রাজ্যে তান্ত্রিকতার চর্চা হইত। মহাপ্রভু চৈতন্য যখন দক্ষিণ ভারতে গমন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার সহিত তত্রত্য বৌদ্ধ পণ্ডিতদের বিচার হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছে এমন কথা এখনও বলা যায় না। চট্টগ্রাম জিলায় এখনও বহু বৌদ্ধ বাস করিতেছেন। উড়িষ্যায় এখনও এই ধর্ম্মের চিহ্ন রহিয়াছে। স্যর চার্লস ইলিয়ট লিখিয়াছেন,—

The Saraks of Baramba, Tigaria and the adjoining parts of Cuttack describe themselves as Buddhists. Their name is modern equivalent of Sravaka and they apparently represent an ancient Buddhist community which has become a sectarian caste. They have little knowledge of their religion but meet once a year in the cave-temple of Khandagiri to worship a deity called Buddhadeva or Caturbhuja. All their ceremonies commence with the formula Ahimsa parama-

dharma and they respect the temple of Puri which is suspected of having Buddhist origin.

কটক জিলার বরম্বা, তিগরিয়া এবং নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের শারকগণ আপনাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। 'শারক' এই নাম 'শ্রাবক' নামের আধুনিক প্রতিশব্দ হইবে এবং সম্ভবতঃ শারকগণ প্রাচীন কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল কিন্তু এক্ষণে এক স্বতন্ত্র হিন্দু সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। আপনাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহাদের কোন বোধ নাই কিন্তু বৎসরে একবার বুদ্ধদেব বা চতুর্ভুজ নামক দেবতার আরাধনার নিমিত্ত খণ্ডগিরির এক গুহায় সমবেত হইয়া থাকে। "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই শ্লোকটি দ্বারা তাহাদের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানের আরম্ভ সূচিত হইয়া থাকে। ইহারা পুরীর মন্দিরকেও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। অনেকে সন্দেহ করেন যে, ঐ মন্দির পূর্ব্বে বৌদ্ধ মন্দিরই ছিল।

বাঙ্গলাদেশে বীরভূম জিলার রামপুরহাটের নিকটবর্ত্তী খরবোনা ও বলেরপুর গ্রামে এবং সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত সাদিপুর, শিলাগুড়ি, জয়তারা, বাঁশফুলি, বিলকান্দি ও হাড়জুড়ি প্রভৃতি স্থানে শারক জাতীয় লোক আজকালও বাস করিতেছে। ইহাদের উপাধি—হন্দ, রক্ষিত, দত্ত, প্রামাণিক, সিংহ, দাস ইত্যাদি। ইহারা মাছমাংস খায় না, সুরাপান করে না। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—ইহারা পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মও ইহার স্বতন্ত্র সত্তা রক্ষা করিতে না পারিবার আরও একটি কারণ আছে। এই দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম যখন পূর্ণ গৌরবে বিরাজিত ছিল তখনও গৃহী বৌদ্ধগণ জাত কর্ম্ম, শ্রাদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম্মে স্ব-স্ব পূর্ব্ব আচার রক্ষা করিয়া চলিত। ইহারা ধর্ম্ম-বিশ্বাসে বৌদ্ধ ছিল কিন্তু সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে ইহাদিগকে কোন স্বতন্ত্র মণ্ডলীভুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারা যাইত না। বৌদ্ধেরা সঙ্ঘের বাহিরে কোন মণ্ডলীগঠনের চেষ্টা করেন নাই, ইহাই তাহাদের সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার বিরোধী হইয়াছিল। স্যর চার্লস্ ইলিয়ট

লিখিয়াছেন—It aimed not at founding a sect but at including all the World as lay believers of easy terms. This principle worked well so long as the faith was in the ascendant but its effect was disastrous when decline began. The line dividing Buddhist lay-men from ordinary Hindus became less and less marked.

বৌদ্ধদের স্বতন্ত্র সম্প্রদায়গঠনের দিকে আদৌ লক্ষ্য ছিল না। এই ধর্ম্ম সহজ সর্ত্তে বিশ্বশুদ্ধ লোককে গৃহী বৌদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। এই ধর্ম্ম যতদিন উন্নতির অভিমুখে চলিতেছিল ততদিন এই নীতি অনুসরণে সুফলই ফলিয়াছিল। কিন্তু এই ধর্ম্ম যখন অবনতির অভিমুখে যাইতেছিল তখন ইহার ফল অতি ভীষণ হইয়াছিল। তখন আর সাধারণ হিন্দুর সহিত বৌদ্ধ গৃহীর স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞাপক রেখা পরিলক্ষিত হইত না।

একদিকে সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াকর্ম্ম, আচার-অনুষ্ঠানের আবেষ্টন রচনা করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা করেন নাই; অন্যদিকে ভারতীয় আর্য্য সমাজ ইহার চিরন্তন প্রকৃতির প্রভাবে বৌদ্ধদিগকে ইহার বিরাট জঠরে গ্রহণ করিবার জন্য মুখ-ব্যাদান করিয়াছিল। এই দুইয়ের সমবায়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মধ্যে আপনাকে নিঃশেষে নিমজ্জিত করিয়াছিল। বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান হিন্দু আচারে পরিণত হইল, বৌদ্ধ মন্দির হিন্দু মন্দিরে পরিণত হইল।

বুধগয়া মন্দিরের আধুনিক ব্যাপার আলোচনা করিলেই বৌদ্ধ-মন্দির কিরূপে হিন্দু মন্দিরে পরিণত হইল তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। বুধগয়া মন্দিরের বর্ত্তমান ভূস্বামী হিন্দু মোহন্ত। তিনি প্রাথমিক মুসলমান আক্রমণকারীদের মত বুদ্ধ-মূর্ত্তি বা মন্দির ধ্বংস করিতে চাহেন না। তিনি চান মন্দির ও আগন্তুক তীর্থযাত্রীদের উপর ভূস্বামিত্ব করিতে। তিনি হয়ত বুদ্ধমূর্ত্তিকে হিন্দুত্বের সাম্প্রদায়িক চিহ্নে চিহ্নিত করিবার অভিলাষী। যে সকল হিন্দু

তীর্থযাত্রী গয়াধামে পিণ্ডদান করিতে যান তাঁহাদের কেহ কেহ বোধি-দ্রুমমূলেও পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। বুদ্ধগয়া অতি সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-তীর্থ বলিয়া এখানে বিদেশ হইতে এখনও বহু অহিন্দু যাত্রী আসিয়া থাকেন। তাহা না হইলে এতদিনে বুদ্ধগয়া হয়ত সর্ব্বতোভাবে হিন্দুতীর্থে পরিণত হইত।

উল্লিখিতরূপ যুক্তি দেখাইয়া স্যর চার্লস্ ইলিয়ট বলেন,—

The same process went a step further in many shrines which had not the same celebrity and effacted all traces and memory of Buddhism.

বুদ্ধগয়ায় যাহা ঘটিয়াছে উহার অপেক্ষা অপ্রসিদ্ধ বহু বৌদ্ধ মন্দিরে তদপেক্ষা কথঞ্চিৎ অধিক কাণ্ড ঘটিয়াছে। উহার ফলে ঐ সকল মন্দির হইতে বৌদ্ধচিহ্ন ও বৌদ্ধস্মৃতি চিরদিনের নিমিত্ত অন্তর্হিত হইয়াছে।

ভারতের অনার্য্য সমাজ, অনার্য্য সভ্যতা যে প্রকারে আর্য্য সমাজের মধ্যে ক্রমশঃ বিলীন হইয়া আর্য্যসভ্যতাকে নব আকার দান করিয়াছে, ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম সেইরূপ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মধ্যে স্বীয় সত্তা নিমজ্জিত করিয়া দিয়া ইহাকে নূতনত্ব দান করিয়াছে।

স্যর চার্লস্ ইলিয়ট বলেন ঃ—

In reviewing the disappearence of Buddhism from India we must remember that it was absorbed not expelled. The result of the mixture is justly called Hinduism, yet both in usages and belief it has taken over much that is Buddhist and without Buddhism it would never have assumed its present shape. To Buddhist influence are due for instance, the rejection by most sects of animal sacrifices the doctrine of the sanctity of the animal life, monastic institution and the ecclesiastical disipline found in Dravidian

religion. We may trace the same influence with more or less certainty in the Philosophy of Sankar.

ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোধান আলোচনা করিবার সময়ে আমাদিগকে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, এই ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হয় নাই, এই দেশের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই সংমিশ্রণের ফলে যে ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে উহা যথার্থতঃ হিন্দু-ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। নামে যাহাই হউক এই ধর্ম্ম অনেক বৌদ্ধ আচার ও ধর্ম্ম বিশ্বাস গ্রহণ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত সংমিশ্রণ না হইলে হিন্দু ধর্ম্ম বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইত না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইহা বলা যায় যে, এখন যে হিন্দুদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় জীববলির বিরোধী, ইহার মূলে বৌদ্ধপ্রভাব রহিয়াছে। 'প্রাণীহিংসা করিব না' ইহা একটি বৌদ্ধশীল। সাধুদের মঠ এবং দ্রাবিড়দেশীয় পুরোহিত শাসনের মধ্যেও বৌদ্ধপ্রভাব পরিলক্ষিত হইতে পারে। একেবারে অসংশয়ে না বলিতে পারিলেও আমরা ইহা বলিতে পারি যে, শঙ্করের দার্শনিক মতের মধ্যেও বৌদ্ধপ্রভাব রহিয়াছে।

গ্রন্থ-সঙ্কলনে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে :

১। Civilisation in Ancient India, Vols. 1 & 11 ... R. C. Dutt.

২। Vinaya Texts ... Sacred Books of the East.

৩। Sutra Pitaka ... Sacred Books of the East

৪। ধর্ম্মপদ ... শ্রী চারুচন্দ্র বসু।

৫। Buddhist India ... T. W. R. Davids.

৬। Buddhism ... T. W. R. Davids.

৭। Early History of India ... Vincent Smith.

৮। Indian Sculpture and Painting ... E. B. Havell

৯। The Ancient & Medaeval Architecture of India ... E. B. Havell

১০। অজন্তা ... শ্রীঅসিত কুমার হালদার।

১১। A Guide to Taxila ... Published by Government of India.

১২। বিশ্বকোষ ... শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

১৩। প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ

১৪। নারায়ণ পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ

১৫। জাতক ... রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ

১৬। Kautilya's Arthasastra .. R. Shamasastry.

১৭। Hinduism and Buddhism ... Sri Charles Eliot.